KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 C.m.
Vol. & Number : ৩/- ৬/- ৩/- ৬/-	Year of Publication : কার্তিক, ১৩৬২ পৌষ, ১৩৬২ ফাল্গুন, ১৩৬২ চৈত্র, ১৩৬২
	Condition : Brittle / Good
Editor : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

সমকালীন

কলিকাতা লিটল্ম্যাগ
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক
সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ~ নারায়ন চৌধুরী

তৃতীয় বর্ষ কার্ত্তিক ১৩৬২

'নতুন ভারত গ'ড়বার এই মহান প্রচেষ্টা...'

বীমা কোম্পানী কি ক'রে জাতীয় পরিকল্পনায় আর্থিক সাহায্য করে

১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জাতীয় পরিকল্পনা ঋণপত্র উপস্থাপিত করবার সময়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশের জনসাধারণকে মুক্তহস্তে ঋণপত্র ক্রয় ক'রে 'নতুন ভারত গ'ড়বার মহান প্রচেষ্টায়' অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কয়েকমাসের মধ্যেই ১৫৬·৭৫ কোটি টাকার ঋণপত্র ক্রয় ক'রে জনসাধারণ তাঁর আবেদনে অকুণ্ঠ সাড়া দিয়েছিল। এই বিরাট অঙ্কের মধ্যে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলোর অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বীমা কোম্পানী-গুলো বরাবরই তাঁদের টাকার একটা বড় অংশ সরকারী সিকিউরিটিতে খাটিয়ে থাকেন। **১৯৫৩ সালের শেষে এই খাটানো টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০ কোটি টাকা।**

বীমা কোম্পানীগুলো দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের সঞ্চয় খাটিয়ে জাতীয় পরিকল্পনায় অর্থের যোগান দিচ্ছে ও সরকারকে জনসাধারণের মান উন্নততর ক'রে তুলতে সাহায্য করছে।

সর্বপ্রকার বীমার বৃহত্তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নিউ ইণ্ডিয়া লক্ষ লক্ষ পরিবারের কাছে জীবনবীমার বার্তা বহন ক'রে চলেছে। তাদের হ'য়ে নিউ ইণ্ডিয়া প্রতিবছর সরকারী সিকিউরিটি ও বিভিন্ন শিল্পে কোটি কোটি টাকা খাটিয়ে দেশের উন্নতি সাধনে সহায়তা করছে।

দি নিউ ইণ্ডিয়া এস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস : বোম্বাই

NI 1221 (B)

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

তৃতীয় বর্ষ কার্তিক ১৩৬২

প্রবন্ধ

সাবেকী কথা : অসিতকুমার হালদার ৯
সমাজধর্মী সত্যেন্দ্রনাথ : কমলা দাশগুপ্ত ২৬
সমকালীন লেখকের কবিত্ব : নারায়ণ চৌধুরী ৪৩

কবিতা

প্রাচীন কবিতা থেকে : সুনীল চট্টোপাধ্যায় ২০
আকাঙ্ক্ষা : সমীরণ গুহ ২১
সপ্তকে : অসীম সেনগুপ্ত ২২
সোনার নূপুর : সুরজিৎ বসু ২৩
একটি পাহাড়ী সন্ধ্যা : অজিতকুমার হাজরা ২৪
অচেনা গন্ধ : চার্লস বোদলেয়র ২৫

গল্প

ক্ষণ বসন্ত : ভবানী মুখোপাধ্যায় ১২
সুসান : অমল দত্ত ৩১

উপন্যাস

পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭

আলোচনা

দেহ ও দেহাতীত : রাখাল ভট্টাচার্য ৫০

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

বৈকুণ্ঠের উইল নাট্যানুষ্ঠান : তারেন বসু ৫৪

পরিচালক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৩

★ ARUNA ★

ARUNA MILLS
MARINA

more DURABLE
more STYLISH

Specialities

SAREES
DHOTIES
SHIRTINGS
POPLINS
LONG CLOTH
VOILS Etc.

in Exquisite Patterns

ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD

★ ARUNA ★

সমকালীন
তৃতীয় বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৬২

সাবেকী কথা

অসিতকুমার হালদার

কৃষ্ণনগরের পরেই বাবার বদলী হল মেহেরপুর সাবডিভিজনে। আমি ছিলাম গবেট ভালমানুষ এবং বেজায় অভিমানী, তাছাড়া ভীষণ ভীতু। কোন অন্যায় কাজ যা ছেলে বয়সে সবাই করে থাকে কখনো করতে সাহস করিনি। তার উপর আবার বামুন দিদির মুখে ভূতের গল্প শুনে শুনে মারাত্মক ভয় ঢুকলো—সন্ধ্যার পর অন্ধকার, বা অন্ধকার ঘরের দিকে কখনো মাড়াই না।

বামুনদিদির কাছে শুনেছি কুনি ভূতের কথা—সে থাকে যে গৃহস্থ নোঙরা, নিজের ঘরের কোণে ঝাঁট দিয়ে আবর্জনা জড় করে রাখে তার বাড়ীতে। বুনো ভূত জন্মায় বাঘ ভাল্লুকে মানুষ যদি খায়, আর সেই ভূত এক পা এক গাছে, অন্য পা একশো গাছ ডিঙিয়ে ফেলে। তারপর ব্রাহ্মণ মরে ব্রহ্মদত্যি, উড়ে মরে উড়ুক্কু, ভূত এইরূপ কাল্পনিক ভূতের অন্ত নেই! আমার মেজদা 'শ্যাম' (ভাল নাম রজতকুমার) বড় হয়ে তিনি ডাক্তার হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভীষণ ডানপিটে, আমার ভূতের ভয় ছাড়াবেনই ছাড়াবেন। বনজঙ্গলের মধ্যে মেহেরপুর সাবডিভিজনে বাবা একটি বিরাট একতলা বাঙলো পেয়েছিলেন। মেহেরপুর এমন জঙ্গুলে জায়গা যে দরজা খোলা পেলে নেকড়ে বাঘ গোসলখানার টবে গভীর রাত্রে এসে জল খেয়ে যায়। একদিন মেজদার দুষ্টবুদ্ধি জাগলো। আমাকে সান্ধ্য ভোজের পর নিলেন সঙ্গে বনে শিকার করতে যাবেন বলে। বাবা গেছেন সরকারী কাজে ক্যাম্পে অন্যত্র। বাবার বন্দুকটি মেজদার দেহের সাইজের চেয়ে অনেক বড়। তিনি শৈশবে ছয় বৎসর বয়সে (বর্দ্ধমানে বাবা থাকার কালে) লুকিয়ে বাবার পিস্তল নিয়ে খেলা করতে গিয়ে গুলি প্রবেশ করিয়ে আওয়াজ করেন—ফলে একটি আঙ্গুল তাঁর উড়ে যায়। তথাপি এই প্রকার অপকর্মে অরুচি নেই তাঁর। তখন আড়শেওড়ার ঝোপে ঝোপে ঝিঁঝি ডাকচে—শেয়াল চেঁচাচ্চে—তক্ষক, নেউল, সাপ সর সর করে ঘুরে বেড়াচ্চে—পথ জঙ্গলের আতিশয্যে ঢাকা—দেখা শক্ত।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেচে, রজনী আগতপ্রায়, সূর্য অস্তগত, চাঁদ দেখা দিয়েচে কালো কালো বিরাট গাছের ফাঁকে। একটি বিশাল বটগাছে বিকট শব্দ হল—আমার বুক ভূতের ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ল। আমি থেমে দাঁড়িয়ে দাদাকে ফেরবার জন্য সকরুণ নিবেদন জানালাম। মেজদার ভ্রূক্ষেপ নেই—মারলেন একটা ইট চোঁ করে—আর সঙ্গে সঙ্গে ডানার ঝাপট দিতে দিতে চিলের মত বড় একটি কাল পেঁচা উড়ে গেল। তারপর মেজদা আমাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন একটি শীর্ণা নদীর তীরে শ্মশানে। আমাকে গান গাইতে বলে মেজদা নিজে অর্দ্ধদগ্ধ পরিত্যক্ত পূতিগন্ধযুক্ত শবদেহের উপর মড়া পোড়ানো বাঁশ দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলেন চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে। জন্মের মত আমার ভূতের ভয় ছেড়ে গেল।

আমার সাবেকী কথার বর্ণনাগুলি সামষ্টিকক্রম হিসাবে এলোমেলো ভাবে লেখা হচ্চেনা। যেটা যখন মনে পড়চে লিখছি—তাছাড়া উপায় নেই। ভগ্নী নিবেদিতার একটি আরো সাবেকী কথা বলব, যা দুঃখের বিষয় তাঁকেও আমি পরে সেকথা মনে পড়িয়ে দিইনি। আমি তখনও কেবলমাত্র অল্পদিন কল্‌কাতার Art School এ ভর্তি হয়েচি। বাবা মা কলকাতায় এসেচেন এক মাতামহীর বাড়ীতে (৪৪নং বেনেপুকুরে) আছেন। শান্তমূর্ত্তি ভগ্নী নিবেদিতা এসেচেন আমার দিদিমার নিকট। সেজমাসী (স্বয়ংপ্রভা দেবী) আমাকে ডাকলেন তাঁকে আমার আঁকা ছবি দেখাতে। আমি তখন সবে রামরাবণ আঁকা ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণ আঁকা ধরেচি। কৃষ্ণের কালীয় দমন, রুক্মিণী হরণ, তাছাড়া বহু বৈষ্ণব সাহিত্যের বিষয় যা বামুনদিদি আর মার নিকট শুনেচি রংএ বা পেনসিলে আঁকতাম। নিবেদিতা ছবিগুলি দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং স্মিত হাস্যে আমাকে বল্লেন "তুমি এখন বালক, শ্রীকৃষ্ণের বিষয় কি বোঝ ?—বড় হলে তবে শ্রীকৃষ্ণ এঁকো।" আমি অবশ্য তখন তাঁর সেই কথার মর্ম কিছুই বুঝিনি। আমি নিজের মনে ছবি এঁকেই চলেছিলাম। পরে আরো বড় হয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে বুঝলাম যে কেন ভগ্নী নিবেদিতা এরূপ কথা আমাকে বলেছিলেন। দুঃখের বিষয় পূর্বে এইরূপ তাঁর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তা আর তাঁকে পরে বলাই হয়নি। নিবেদিতার কাজেই আন্তরিকতা ছিল, এবং তিনি সকলের কাজেও আন্তরিকতা দেখাতে চাইতেন। তিনি ফ্যাসানদস্তুর ইজিনের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তো আজকালকার দেশী আর্টিস্টদের বিলাতি আধুনিকতার নকল দেখে তিনি নিশ্চয় মর্মাহত হতেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁর মত মাতৃস্থানীয়া দেবীকে দর্শন করেচি এবং তাঁর স্নেহশীতল বাণী ক্রমাগত লাভ করেচি। এখন যখন কখন কখন সতীর্থ সুহৃদ শৈলেন, ক্ষিতিশ বা নন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন আমরা তাঁর কথা স্মরণ করে থাকি। নিবেদিতার তৎকালীন একটি কাজ আজও স্পষ্ট মনে আছে, যার জন্য তাঁকে স্মরণ করে মাথা নত করি। একদিন বাগবাজারে তাঁর আবাস-স্থলে গণেন মহারাজ (পরে সংসারী গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) আর আমি গেছি। তাঁর বাড়ীতেই তাঁর যে একটি গরীব মেয়েদের স্কুল ছিল তাতে ধর্মনীতি শিক্ষার সঙ্গে তিনি সকল শিক্ষা দিতেন। সেদিন গিয়ে দেখি, নিবেদিতা স্বয়ং ঝুড়ি ঝাঁটা হাতে পাড়ার কয়েকটি মহিলা এবং ছাত্রীদের নিয়ে পাড়ার রাস্তা সংস্কার করছেন। বাড়ীর দরজার সামনে ফেলা প্রত্যেক বাড়ীর আবর্জনা সরিয়ে সরকারী

ডাস্‌ট্‌বিনে ফেলচেন এবং প্রত্যেক গৃহের গৃহস্থ স্ত্রী পুরুষদের অনুরোধ করছেন যাতে ভবিষ্যতে নিজেদের সামনে না ফেলেন, ডাস্‌ট্‌বিনে ফেলেন। তারপর যতবার আমরা বাগবাজারে তাঁর বাড়ী গেছি পাড়ার পথঘাট অপরিচ্ছন্ন দেখিনি। অবশ্য এর বহু পরে গান্ধীজী সস্ত্রীক এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে জগৎ চমৎকৃত করেছিলেন।

চোদ্দ বৎসর থেকে ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমার স্কুলের লেখাপড়ার সঙ্গে বাঙলা সাহিত্য চর্চার কথা বলা যাক। আমার সাহিত্য চর্চার সূচনার নমুনা আজও দেখতে পাই বাবার লাইব্রেরী ঘরে রাখা একটি লেজারের খাতায়। বঙ্কিম, নবীন, হেম বাঁড়ুয্যে, রবীন্দ্রনাথ, ভারতচন্দ্র ছাড়াও হেম ভট্টের অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণ, কালী সিংহের মহাভারত একে একে লুকিয়ে লুকিয়ে চিলেকোঠায় ছাদের উপর বসে বসে পড়ে ফেলেচি। তখন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার মধ্যে 'প্রদীপ' ছিল। তারপর এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হল 'প্রবাসী'। সেগুলি থেকেও ভাল ভাল অংশ যা মনে লাগতো সেই লেজার খাতায় তুলতে বাদ যেতো না। স্কুলপাঠ্য জিউম্যাট্রি, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল অপেক্ষা এইসব বই পড়ার অধ্যবসায়ের পরিচয়ই আমি অগ্রে দিয়েছিলাম এবং তারই ফলে আমাকে স্কুল ছেড়ে Art School এ গিয়ে ভর্ত্তি হ'তে হয়েছিল। আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে হিরন্ময় রায়চৌধুরীর সহপাঠীর সঙ্গে সৌহার্দ্য হয় এবং তিনি আমাকে তাঁর সুন্দরবনে নৌকা যোগে শিকার করতে যাবার লোমহর্ষক গল্প করেন। আমি সেই গল্পটিকে নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করি। নদিদি পড়ে বলেছিলেন সংশোধন করে দেবেন। কিন্তু তা কার্য্যে পরিণত হয়নি—কালের কপোলে আজ তা নিহিত। এখন মনে হয় সেই ব্যর্থ সাধনার পক্ষে তা ভালই হয়েচে! জীবনে আর তার পর উপন্যাস লিখিনি।

ক্ষণ বসন্ত

ভবানী মুখোপাধ্যায়

বিষানপুরের বাঁকের মুখে নদীটা যেখানে এসে শিশেখালে পড়েছে সেই মুখটায় একটা লক্‌গেট আছে। এই অঞ্চলের সব স্টীমার এই পথে চলাচল করে। ধনেখালির বড়ঠীমার ঘাটও কাছাকাছি, তাই বিষানপুরের বাঁকের নাম ডাক কম নয়।

ঘাটটার ওপরেই খালের গা ঘেঁষে পর পর কয়েকটি দোকানঘর, টিনের ছাত আর বাঁশ বাঁখারির বেড়া। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দোকান করেছে, যে যেমন খদ্দের সে তেমন বেছে নেয়। বেশীর ভাগই ভাতের হোটেল। আগে এমনটা ছিল না, মিলিটারির কৃপায় এতশত হয়েছে। পাকা রাস্তা হয়েছে, খালের গায়ে সিমেন্ট জমিয়ে দু চারটে বস্‌বার বেঞ্চও হয়েছে। কাছারি-কারখানার দিন হেটো খদ্দের এসে ভীড় জমায়, আর ছুটির দিন মোটর চড়ে আসে সহরের বাবু ভায়ার দল। সেদিন মেলা বসে যায়। যে যা পারে সে তাই বিক্রী করে। বেশীর ভাগ ডাব আর কলার বেপারী।

প্রথম দোকানটা মতিবিবির। বেশ জম্‌কালো দোকান, চালুও খুব। ভাত, রুটি, গোস্ত, পোনামাছের ঝোল সবই পাওয়া যায়। খাতা নিয়ে বসে থাকে মতিবিবি, খদ্দেরের পাতে যেমন জিনিষ পড়ে অম্‌নি গহরালি হাঁকে ভাত দ্বিতীয় দফা, বেগুনভাজা দুখানা, মাছ একখণ্ড। মতিবিবি ঠিক ঠিক দাম ফেলে। মেয়েমানুষ হলে কি হয়, এক পয়সা ঠকাবার সাধ্যি নেই কারো। লেখাপড়া জানা মেয়েছেলে, কেউ পারে ওর সঙ্গে। দেয়ালের গায়ে কোরাণের বাণী লেখা ফরাসী তস্‌বির বাঁধানো রয়েছে, তার পাশে পাখাওলা ঘোড়ার ছবি, ঘোড়ার মুখটা মানুষের মত।

সারা অঞ্চলটায় পেঁয়াজ-রসুনের উৎকট খোস্‌বু ছড়ানো আছে। এখানকার প্রধান আকর্ষণ মতিবিবির দোকান। বয়সটা তেমন কাঁচা নয়, কিন্তু গতরটা শক্ত। ছিমছাম গড়ন, টিখর নাক, বড় বড় একজোড়া ডাগর চোখ আর মাজা মাজা গায়ের রঙ। সুন্দরী না হলেও নেহাৎ ফেলনা নয়। লক্‌গেটের জমাদার মোকসেদ এই নিয়ে বোধ হয় হাজারবার চিন্তা করলো মতিবিবিকে সাদী করে ঘর বাঁধতে পারলে মন্দ হয় না। ওর হাতে দু পয়সা আছে। চালাক মেয়েছেলে ডাকঘরে জমা রাখে। নগদ টাকা হাতে রাখেনা।

নিজের হাতে চা বানাচ্ছিল মতিবিবি, শেষবারের মত চায়ের গরম পুটলিটা মোটা কাঁচের গ্লাসে চিম্‌টে দিয়ে নিঙড়ে দিয়ে দুধ ঢালছিল, এমন সময় আওয়াজ শুনে থম্‌কে থেমেছে। আওয়াজটা মোক্‌সেদের কানেও গেছে, সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল।

ভারী সুন্দর একখানি নৌকা এসে ঘাটে লাগছে, নৌকা না বলে বোট বলাই যায়। কাঠের সুন্দর ছই, শাদা রঙ করা, তার গায়ে কালো অক্ষরে লেখা 'ছোলতান'।

মোক্‌সেদ সখেদে বলে ওঠে—"কোথাকার সুলতান রে বাবা, চা পানি খাওয়া আর হল না মতিবিবি।"

মতিবিবি পানের পিক্ ফেলে বলে—"যা ঘুরে আয়।"

ঘাটের গায়ে এসে যখন নৌকাটা ভিড়্‌ছে তখনও মোকসেদ এতটুকু আগ্রহ দেখায় না। ঘাটে লাগালেই পয়সা নেবে, রসিদ কেটে দেবে। বাইরে থেকে দেখা গেল লগী ঠেল্‌ছে একজন জোয়ান মিন্‌সে। পরণে রঙীন সিলকের লুঙি, গায়ে হাওয়াই সার্ট, বেশ রঙদার আদমি। কয়েকবার বেয়াড়াভাবে সামনে এগিয়ে পিছনে হটে তবে নৌকা ভিড়্‌ল। মোক্‌সেদ সেই দিকে তাকিয়ে আছে, এতটুকু আগ্রহ দেখাবে না। তারপর লোকটা নৌকা থেকে লাফিয়ে ডাঙায় পড়লো। নৌকাটা বেশ করে বাঁধলো। তারপর আবার নৌকার ভেতর ঢুকে পড়লো, পরমুহূর্ত্তেই মাথায় একটা লাল ফেজ এঁটে বেরিয়ে এল।

মতিবিবিকে সাম্‌নে পেয়ে লোকটা প্রশ্ন করে—"ডাকঘর কোন্‌দিকে বিবি সাহেব?"

"বিষানপুরের ডাকঘর? এখান থেকে প্রায় তিনকোশ পথ হবে, গাঁয়ের ভেতর, হাটের গায়ে। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে।"

নবাগত হতাশ হ'ল। গাঁখানা যেন শিশেখালের গায়ে হলেই ভালো হত। সেলাম জানিয়ে বিষানপুরের পথে চল্‌লো, আর মোক্‌সেদ নৌকাটা ভালো করে তল্লাস করতে গিয়ে দেখ্‌লে ভিতরে প্রায় অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় এক বিবি শুয়ে আছে।

"ইয়ে আল্লা।" বলে সভয়ে সরে এল মোকসেদ।

"কাছিমুদ্দির নামে কোনো মণিঅর্ডার আছে মাষ্টার সাহেব? তারে পাঠাবার কথা।"

মুখ না তুলেই পোষ্টমাষ্টার বল্লেন—"না"

"ঠিক বল্‌ছেন?"

"এলো কি না এলো আমি জান্‌বো না তো কি তুমি জানবে? কি মিঞা?"

ম্লানমুখে দোরের দিকে এগিয়ে গেল কাছিমুদ্দি, কি ভেবে আবার ফিরে এসে প্রশ্ন করে—"কিংবা ছোলতানের নামে, অনেকে আমাকে ঐ নামেও ডাকে সাহেব।"

"কেন বক্‌বক্ করছ মিঞা, গেল তিনমাসের ভেতর একটা পয়সা মনিঅর্ডার আসেনি। বুঝলে?"

করার কিছুই নেই, আবার তিনমাইল হেঁটে গিয়ে নৌকায় উঠ্‌তে হবে।

নৌকায় উঠ্‌তেই মধুরগলায় প্রশ্ন হল—"কি হোল, এসেছে?"

লয়লা উঠে পড়েছে, সাড়িটা পাল্‌টে আস্‌মানি রঙের পাটের সাড়িটা পরেছে।

চমকিত হয়ে কাছিমুদ্দি প্রশ্ন করে—"এত সাজ পোষাক কিসের গো ?"

"বলি, গিল্‌তে হবে না ? ক্ষিধেয় তেষ্টায় প্রাণটা যে টা টা করছে।"

"টাকা আসেনি।"

"পোড়া কপাল আমার—এখন তাহ'লে কি হবে ?"

"আমি কি কর্‌বো !"

"কত আছে তোর কাছে ?"

"চোদ্দ আনা। তোর কত আছে—?"

অনেক খুঁজে পেতে খালি বিস্‌কুটের টিন থেকে আট আনা বেরোল।

"তাহ'লে হল একটাকা ছ'আনা, জয়নালকে একটা তার পাঠাই।"

"ডাকঘর কি অনেক দূর ?"

"অনেক দূর, মাজা ভেঙে গেছে—"

"তাহ'লে দৌড় দে, নইলে আবার বন্ধ হয়ে যাবে।"

নৌকায় আর কিছু না থাক, চোরাই মদের অভাব নেই। এই অঞ্চল জুড়ে চোরাচালানির কারবার করে কাছিমুদ্দি। ফাউন্টেনপেন, ঘড়ি, কাপড়, মদ—সব কিছু। সেই টাকা আস্‌ছেনা। ওধারে হাঙাৎ দেরী করছে। ডাকঘর যাওয়ার আগে বেশ একপাত্র টেনে নিল কাছিমুদ্দি।

তারবাবুকে চারআনা ঘুষ দিয়ে তার পাঠানো হল। বিষানপুর পোষ্টমাষ্টারের ঠিকানায় জল্‌দি টাকা পাঠাও।

পোষ্টমাষ্টার বাবু বল্লেন : "কাল কিন্তু রবিবার, টাকা এলেও দেবনা কিন্তু।"

সেইরাতে কাছিমুদ্দি আর লয়লা দুজনে মিলে একটা বোতল শেষ কর্‌লো। তারপর বিশ্রী কলহ সুরু হল, অনেক কুৎসিত বাক্য বিনিময় হ'ল। রবিবার ভোর থেকে প্রবল বর্ষা নাম্‌লো।

কাছিমুদ্দি ঘুম ভেঙে উঠে দাড়ি কামালো। লুঙিটা পালটিয়ে একটা ধোপদস্ত পায়জামা পরলো, একটা ফিজি সিলকের সার্ট গায়ে চড়ালো। বেরোবার সময় রীতিমত জেনটেলম্যান।

পিছন থেকে লয়লা বলে ওঠে—"ওরা যদি টাকাই না দেয় বেরিয়ে কি লাভ ?"

"টাকা যদি এসে পড়ে ঘুষ-ঘাষ দিয়ে নিয়ে নেব।"

পথ কয়েকবার যাতায়াতে বেশ পরিচিত হয়েছে। নোওরা পল্লী, আর শান্ত গ্রাম। এই জলে গরু আর হাস-মুরগী বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছে। ডাকঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছাতেই পোষ্টমাষ্টার হেঁকে ওঠে—"কিছু আসেনি।"

"কতক্ষণ আছেন মাষ্টার সাহেব ?"

"এগারোটা পর্য্যন্ত।"

"আচ্ছা, আর একবার না হয় আস্‌বো।"

এগারোটার সময় যেতে মাষ্টার মশাই সেই ভাবেই মাথা নাড়লেন। কাছিমুদ্দি বলে—"আচ্ছা, কালতক দেখা যাক্, কাল নিশ্চয়ই আসবে।

"তোদের কালে পেয়েছে রে, কাল আর হবেনা। বলি ঘটি বাটি নেই ঘরে, বাঁধা দিগে যা—"

"হাতঘড়িটা পর্য্যন্ত বেচে দিয়েছি মাষ্টার সাহেব।"

মাসখানেক আগে এই কারবারের সূত্রপাত। জয়নাল বলেছিল, "দেখ, কাছিমুদ্দি, সোজা কারবার, মূলধনও তেমন চাইনা, একটু যা ভয়ে ভয়ে থাকচি। মাল পাঠাবো আমি, তুই রাতের অন্ধকারে পার হয়ে যাবি। তারপর মহাজনের ঘরে মাল তুলে দিবি। পরে যা টাকা পাবো দশআনা ছ'আনা বখ্‌রা।"

"কি রকম লাভ হবে ?"

"লাভের কি আর ঠিক ঠিকানা আছে, কখনো দুশো পাঁচশো, কখনো বা হাজার।"

তার কয়েক সপ্তাহ পরে সব ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে। নৌকাটাও জয়নালের, সে বলেছে পরে একটা ষ্টীমলঞ্চ কিনে নেবে। এর ভেতরেই লয়লা এসে জুটেছে।

"কিরে জলে জলে বেড়াতে হবে! পারবি ? ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াব, তারপর সময় বুঝে ভেসে উঠ্‌ব। ভয় করবে ?"

একগাল হেসে লয়লা বলেছিল, "ভয় আবার কিসের ? টাকার ভাগ পাবত' ?"

কাছিমুদ্দি অস্বীকার করেনি।

জয়নাল প্রথম কিস্তির টাকা পাঠাতে খেলাপ করছে। এদিকে হাতে একটি নেই।

লয়লা বল্‌ছিল—"চিরকাল লোক ঠকিয়ে কাটালি এখন দেখ তোর কি অবস্থা।"

"ঠকাইনি কাউকে। ঠক্‌বোনা নিশ্চয়ই। কিন্তু তুই চলেছিস কোথায় ? এমন সাজ সজ্জাই বা কেন ?"

"তোর মুখের পানে তাকালে ত' আর পেট ভরবে না। ক্ষিদেয় প্রাণটা জলে যাচ্ছে।"

"বাইরে বৃষ্টিতে ভিজলে কি ক্ষিধেটা জল হয়ে যাবে ?"

একথার কোনো জবাব দেয় না লয়লা। পাঁচটা বেজে গেল লয়লা আর ফেরে না।

ধীরে ধীরে নৌকা থেকে বেরিয়ে মতিবিবির দোকানে ঢুকলো কাছিমুদ্দি। মোকসেদ আরো দুজন মাল্লাকে সঙ্গে নিয়ে বিন্তি খেলছিল।

গলার স্বরটা একটু নরম করে কাছিমুদ্দি বলে—"কি পানিরে বাবা, তাস খেলারই দিন বটে।"

"তিনজনে আর কি খেলা হয় কর্ত্তা।" বললো মোকসেদ।

সামনে তাসে বস্‌লো কাছিমুদ্দি। তাসের খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে জমে ওঠে। দু এক পাত্র চা আর পেঁয়াজি উড়ে গেল। কাছিমুদ্দি কয়েকটা মজার গল্প বল্‌ল। তারপর একটুকরো পাঁউরুটি

চেয়ে নিয়ে সেটাও শেষ করল। হাত দিয়ে ছিঁড়ে কাঁচা পেঁয়াজের টুকরো দিয়ে রুটিটা শেষ করলো কাছিমুদ্দি।

"হুঁ।"

"ব্যাপার কি?"

"ওদিকে দেখো কর্ত্তা, বিবির মুখটা গোমড়া হয়ে গেছে।" বল্‌ল মোক্‌সেদ।

ভালো করে বিবির মুখের দিকে তাকালো কাছিমুদ্দি। চেহারাটা খুবসুরত না হলেও মন্দ নয়! চাউনিটা নেহাৎ অকরুণ নয়।

মোকসেদের বাড়ি থেকে ডাক্‌তে এসেছে। বাকী দুজন মাল্লাও উঠে গেল। কছিমুদ্দি একা।

সবাই চলে যাওয়ার পর পকেটে হাত দিয়ে বোকার মত মুখ করে কাছিমুদ্দি বলে, "ঐরে. নৌকোয় মণিব্যাগটা রেখে এসেছি। রুটির দামটা পরে দেব বিবিসাহেব। না হয় নিয়ে আসি—"

"আরে থাক্, থাক্, তার জন্য কি মিঞা।"

"আচ্ছা তাহ'লে কাল দেব, ক'দিন এখনো থাকতে হবে হয়ত।"

ফেরার পথে লয়লার দেখা হল। তার মুখটা হাসি হাসি।

"কোথায় গিছ্‌লি রে?"

"গাঁয়ে বেড়িয়ে এলাম।"

"কি করলি সারাদিন।"

"কিছু না, হাট বাজার দেখ্‌লাম।"

"আমারও সেই অবস্থা।"

"কিন্তু মুখ থেকে পেঁজের গন্ধ ছাড়ছে, আমাকে ফাঁকি দিবি। আমিও এক পেট খেয়ে এসেছি বাজারের হোটেলটায়, বলে এসেছি কাল তুই গিয়ে হিসেব মিটিয়ে দিবি।"

"তোকে এমনি ধার দিলে?"

"দেবেনা, তোর সঙ্গে থেকে এটুকু আর পারবো না।

পরের দিন দু বার পোষ্টাফিস ঘুরে এসে যখন ঘাটের ধারে পৌছল কাছিমুদ্দি দেখে একটা জীপ্ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। লয়লার টিনের সুটকেস্‌টা গুছিয়ে রাখছে একজন, হয়ত ড্রাইভার।

লায়লা সেজেগুজে গাড়িতে উঠতে গিয়ে কাছিমুদ্দিকে দেখে বল্‌ল—"মনে কিছু করিসনা রে, কাল এই মিঞা সাহেবের সঙ্গে হোটেলে আলাপ হল। ভারী সরিফ মানুষ। আমাকে সহরে পৌছে দেবে। যাই, এখানে থাকলে শুকিয়ে মরতে হবে।"

"যা চুলোয় যা।"

"তা তো যাবো, তোর মত লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে বেড়ানোর চেয়ে সোজা রাস্তা ধরা ঢের ভালো।"

"ঝুটা বাত।"

"মিথ্যুক, হাড় মিথ্যুক।"

বাকী কথা চলন্ত জীপের আওয়াজে শোনা যায় না।

বিকালে আবার পোষ্টাফিস।

এইবার মাষ্টার সাহেব হেসে বল্‌লেন—"একটা তার এসেছে। কাছিমুদ্দি তোমার নাম তো?"

"কত টাকা?"

"টাকা নয়—শুধু তার।"

তারের অর্থ টাকা পাঠাতে আরো সময় লাগবে। ব্যস্ত হয়োনা।

মতিবিবির দোকানে উঠে করুণ গলায় কাছিমুদ্দি বলে—"আজ আবার বোনটা চলে গেল কল্‌কাতা, ঘরের খবর খারাপ।"

"ও তোমার বোন্ নাকি?"

"হ্যাঁ, মামাত বোন, আমার কাছেই থাকে।" তা ক'দিন মনে করেছি তোমার এখানেই খাবো বিবিসাহেব।"

"আমাদের আবার খাওয়া। বেশ, যা হয় যোগাড় হয়ে যাবে।"

কাছিমুদ্দি সারাজীবনে বোধকরি এমন ভালো আর খায়নি। পাতাটা পর্য্যন্ত চেঁচে পুঁছে খায় কাছিমুদ্দি। মতিবিবি নিজে হাঁকে—"আর দুটি ভাত দিয়ে যাও।"

সলজ্জ ভঙ্গীতে মতিবিবি বলে—"বড় বেপোট জায়গা, মাছটা নদীর ধার হলে কি হয়, রোজ পাওয়া যায়না।"

"সিগ্‌রেট আছে।"

"আছে, বাজে সিগরেট, চরমাইনর। বাজারে ভালো পাওয়া যায়।"

পাওয়া যায় যেমন দামও দিতে হয়, তাই কাছিমুদ্দি চরমাইনর ধরিয়ে পরমানন্দে টান দেয়।

সারাদিন মহানন্দে দোকানে বসে কাটিয়ে দেয় কাছিমুদ্দি। মতিবিবির কাজ সমান তালে চলে। গহরালি ভাতের থালা নিয়ে ছুটোছুটি করে—দু একটা পাট বোঝাই নৌকা আর ষ্টীমার মাঝে মাঝে ছুটে যায়।

নিয়ম করে সকাল বিকাল ডাকঘরে দৌড়ায় কাছিমুদ্দি।

মাষ্টার যথারীতি মাথা নাড়েন। কাছিমুদ্দির ভয় বাজারের আফগানী হোটেলের মালিক আবার টাকা না চায়। লায়লা সেখানে ধার করে খেয়েছে। শয়তানিকে নিয়ে প্রথম একদিন সেই সেখানে ঘুরে এসেছিল। লয়লার বাক্স থেকে লুকানো টাকা নিয়ে।

মতিবিবির হোটেলের রান্না চারদিন খেয়ে কিন্তু কাছিমুদ্দির গায়ে গতরে মাংস লেগেছে।

দোকানে ঢুকেই কাছিমুদ্দি বলে—"বা বেড়ে খাসির গোস্তের খেস্‌বু বেরিয়েছে ত'!"

"ভুল করলেন মিঞা। দুম্বার গোস্ত পাওয়া গেছে আজ। বাঃ বেড়ে চশমাটা পরেছেন ত' ?"

"এ ধূপের চশমা। চোখ ঠাণ্ডা থাকে!"

"আমাকেও চশমা নিতে হবে, ছুঁচে সুতো গলাতে পারিনা রাতের বেলায়।"

একটা কিছু বলা দরকার। এদিকে অনেক টাকা বাকী পড়ে গেছে। চেয়ে বস্‌লেই হল। না চেপে যাবে।

পোষ্টমাষ্টার আজ খুশী মনে বল্লেন—"একটা চিঠি এসেছে তোমার—কাছিমুদ্দি ত' ?"

চিঠিটা পাঠিয়েছে লয়লা। কাকে দিয়ে লিখিয়েছে। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথার পর জানিয়েছে জয়নালের সঙ্গে শিয়ালদা ষ্টেশনে দেখা হয়েচে। আর দুচারদিনের ভেতর টাকা পাওয় যাবে আশা হয়। মণিঅর্ডারে পঞ্চাশ টাকা পাঠাচ্ছি। যে লোকটার সঙ্গে এসেছিলাম সে মাঝে মাঝে দেখা করে। লোকটা ভালো।

সেদিনের বিন্তি খেলা জম্‌লো। দু বোতল ধেনো আনিয়েছিল কাছিমুদ্দি। তার বদান্যতায় সবাই মুগ্ধ। রাতে সবাই চলে যাওয়ার পর মতিবিবি বাক্সটার তালা টেনে দেখ্‌ছে ঠিক এঁটেছে কিনা।

ধরা গলায় কাছিমুদ্দি বলে—"বিবিজান—"

"কি মিঞা সাহেব ?"

"কিছু বলি মনে করি, আজ মনে হয় বলেই ফেলি, মনে করছিত আমরা—"

কাছিমুদ্দি লোকটা আসলে অসৎ নয়, তার কাছে সহৃদয়তার দাম আছে। এই জায়গাটা মন্দ নয়, মতিবিবি মানুষটাও ভালো। দু পয়সা আছে। এইখানেই থাকা যাক, ঘর বাঁধা যাক মতিবিবিকে নিয়ে—

"বিবিজান হপ্তাখানেক আগেই চলে যেতাম, কিন্তু ভাব্‌ছি—"

গ্লাসটা শেষ করে কাছিমুদ্দি বলে—"ভাব্‌ছি, তোমার হুকুম পেলেই যাওয়া যায়—ভাব্‌ছি—"

এখানে থাকলে খাওয়ার ভাবনা নেই, দিনগুলো বিন্তী খেলে মতিবিবির নিরাপদ আঁচলের আড়ালে কাটানো যায়।

"মিঞা সাহেব—"

"আমি সাধারণ মানুষ—গরীব ঘরের ছেলে—"

"কি বল্‌বেন মিঞা সাহেব!"

এমন সময় একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এল,—"মিঞা সাহেব, কাছিম মিঞা—এসেছে,—"

"কি এসেছে রে ? কি ব্যাপার রে ?"

"আপনার টাকা, আমাকে দিয়ে মাষ্টার সাহেব খবর পাঠিয়েছে।"

মতিবিবি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

অবশেষে জয়নাল পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছে। ফিরে যেতে বলেছে আবার সেই পন্নার চরে। সেখান থেকে হয়ত আবার কিছু মাল তার হাত দিয়ে পাচার করবে।

মতিবিবি শুখ্‌নো গলায় বলে—"কি যেন বল্‌ছিলেন মিঞা সাহেব!"

"বল্‌বো, সব কথা বল্‌বো। এখনই একবার ডাকঘরে ছুট্‌তে হবে।"

একটু ইতঃস্তত করে কাছিমুদ্দি, গলার স্বরটা আট্‌কে যায়। সত্যি কিছু সে বল্‌তে চেয়েছিল। আর একটু দেরী হলে এখানেই থাকতো হয়ত সারাজীবন। সে অকৃতজ্ঞ নয়।

তিনবেলা এমন ভালো খাওয়া কোথায় জুট্‌বে। কিন্তু সে মরদ। খেটে খেতে হবে তাকে। বিন্তি খেলে দিন কাটালে চলবে না।

দরজার চৌকাঠ পার হওয়ার সময় মনে হল ভুল করছে কাছিমুদ্দি। কিন্তু ছুটতে হয়। ডাকঘরে টাকা এসেছে, সেই টাকার জন্যে দিনে তিনবার করে গাঁয়ে ছুটেছে খবর নিতে।

মনে মনে বলে কাছিমুদ্দি 'টাকা আসবে আমি বরাবর জানি।' টাকা তৈরী ছিল আজ পোষ্ট মাস্টার একগাল হেসে টাকা দিয়েছেন। পাঁচ টাকার মিষ্টি কিনে দিয়েছে কাছিমুদ্দি। ফেরবার পথে আফগানি হোটেলে লয়লার দরুণ বাকী পাওনা দিয়ে ঘরে ফিরেছে।

সন্ধ্যার পর মতিবিবির দোকানে হাজির হল কাছিমুদ্দি। "কত পাওনা আমার ?" গলাটা একটু কেঁপে উঠল।

কুড়ি টাকা পাওনার বদলে মতিবিবিকে পঞ্চাশ টাকা দিল কাছিমুদ্দি।

পনের মিনিটের মধ্যেই 'ছোলতান' আবার দাঁড় টেনে নদীর পথে পাড়ি দেয়। মতিবিবির জানালায় একখানি পরিচিত মুখ দেখা যায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাছিমুদ্দি।

জয়নাল হারামজাদা এত জল্‌দি জল্‌দি যদি টাকাটা না পাঠাত।

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল মতিবিবির ঘরের টিমে টিমে আলো। ক্ষণিক বসন্তের শেষ স্পর্শ গায়ে লাগছে মতিবিবির। কাছিমুদ্দির নোটগুলি হাতে নিয়ে জানলার ধারে তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মতিবিবি।

প্রাচীন কবিতা থেকে

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

কবিতার রক্ত তুমি কতবার মুছেছ ও-চুলে,
তবুতো তিমিরচল আজো একবেণীতে ধরো নি ;
কত যে কথার জ্বালা হোলো ঐ কোটালের মণি,
কবরী রচনা তারা করো নাই কী নির্মম ভুলে !

সেই চোখ মেলে আছো,—বিস্ফারিত কালের প্রহর
পায়ে পায়ে ঠেলে দাও এ যে কোন কম্পিত চূড়ায় ;
চেতনার খরস্রোত চূর্ণ চূর্ণ বিদ্যুৎ উড়ায়
যে-চুম্বক ধরে আছো, টানে তার স্নায়ু যে জর্জর !

আমার একাগ্র বিশ্ব মুক্তি চায়। আমার কবিতা
অসংবৃত সমুদ্রের ক্ষমাহীন স্বেচ্ছাচারিতায়
উচ্ছ্বসিত আর্তনাদে দিগভ্রষ্ট ভেসে চলে যায়,
দ্বিধা ভাগ করে কাল জাগো জাগো জীবনের সীতা।

একমাত্র দৃষ্টিপাতে দাও ব্যগ্র জীবনে স্বাক্ষর,
কুন্তলের স্বর্ণজালে মুখ ঢেকে রেখোনাকো আর ;
ফাটুক স্তনের চোলি, আবরণ কাঞ্চন জঙ্ঘার,
শ্বেত নিস্তব্ধতা রক্তে হোক শেষ সত্তার ভাস্কর!

আকাঙ্খা

সমীরণ গুহ

এখনো সূর্যের কাছে আলো চাই,
মানুষের কাছে চাই প্রেম ;
যে জীবন দেয়নি কিছুই,
তারো কাছে চেয়েই গেলেম।
সময় নদীর তীরে ঢেউ গুণলেম,
আর কিছু নয় ;
সসম্পদা কত তরী চলে গেল পথ বেয়ে তার,
দু'পারের বালুচরে ফেণা হয়ে থেকে গেল আকাঙ্খা আমার।

এখনো পাখীর কাছে গান চাই,
রং খুঁজি কুসুমে পল্লবে ;
তবু কেন তাকে খুঁজি
ছলনায় যে বেঁধেছে কবে,—
যদি তাকে পাই ;
পিছনের স্মৃতি পথে যতই তাকাই,
দেয় নি সেদিন ও যে, সে দেবে নাকো আর,
পথের দু'ধারে তবু ফুল হয়ে ফুটে থাকে আকাঙ্খা আমার।

তবুও সূর্যের কাছে আলো চাই,
মানুষের কাছে চাই প্রেম ;
যে জীবন দেয়নি কিছুই
যার কাছে নেই লেন দেন,
তবু তাকে খুঁজি অবিরত
উদাসীন ঈশ্বরের মত ;
আমার সম্পদটুকু তাকেই দেবার,
পৃথিবীর ধুলো হয়ে পথে পথে পড়ে থাকে আকাঙ্খা আমার।

সপ্তকে

অসীম সেনগুপ্ত

এখনও বাতাসে শুনি সহসা কাঁকন কার বিনম্র সুরে ;
বিদেহী কথার কলি সপ্তকে গেঁথে যায় দূর থেকে দূরে—
কোন এক থরো থরো দীঘল ঝাউয়ের বনে। মধুমতী গানে,
কামনা কপোতগুলি মৃদু রূপরতি আনে বিমুগ্ধ প্রাণে॥

স্বপ্নত মধ্যরাতে নেমে আসা মেঘছায়া পিছল নেশায় :
অরণ্য বাতাসের ভাঙ্গা ঢেউয়ে স্বরলিপি এঁকে রেখে যায় ;
তারপর যতি টানে। কোন এক নীড় তৃষা মগ্ন-বধূর,—
প্রাক্তন রূপকথা জলছবি হতে চায় মুখর মধুর।

(তবে মুখর মধুর হোক।)

তবু যদি কোনখানে বাতাবীফুলের মত একটি হৃদয়,
নির্জন তন্ত্রীতে সুর সেধে তবু হয়—তবু যদি হয়—
ধুলো-মাটি-রোদ ছাওয়া একটি নীরব কথা : ভীত সংলাপ ;—
তবে বলি বিদেহিনী এ নিকষ প্রচ্ছদে তোমার প্রেমেরই অপলাপ।

এখনও অবাক প্রাণে সুদূরের আর্দ্রতা মেঘদীপ হয়ে
জল-কুচি ঘ্রাণ আনে একটি বিলীন তটে কত বিস্ময়ে !
যখন কথার শেষে লুব্ধ প্রয়াণগুলি ঘন হয়ে আসে,
নীরব রোমন্থনে মুখোমুখি বসে থেকো অতীতের পাশে।

সোনার নূপুর

সুরজিৎ বসু

ললিতের হাত ধরে চলে গেছি মালকোষ দরবারী সুরে
তবু তার স্বে মহিমি সোনার নূপুরে ;
আমাকে আরও ডাকে, নিয়ে যায় দূর হতে আরও সুদূরে।

মন তার অনিবার গানের অঞ্জলী
ফুলে ফলে ভরে তোলে সর্ব বনস্থলী।
অশ্রু তার ঝরে পড়ে অন্ধকার তারার আকাশে,
চোখে তার শবরীর অসীম পিপাসা।

কত সূর্য ডুবে গেল, কত অমাবস্যা রজনীরা
হেসে গেল তারাদের চাপা হাসি দিয়ে।
বৈশাখের রুদ্র দিন শান্ত হ'ল শ্রাবণের বানে ;
অঘ্রাণের ঘ্রাণ ভরা চঞ্চল বাতাস
ঢেউ তুলে তুলে যায় কিষাণীর মনে।
প্রজাপতি মন কত কুসুমের প্রাণের গভীরে
কত প্রেম ভালোবাসা জমা হ'ল পাখীদের নীড়ে।
তবু আশা মাথা কোটে ছন্দহীন কলাপের দেয়ালে দেয়ালে
তবু তার তৃপ্তিহীন মন
খুঁজে ফেরে যেই খানে বিদগ্ধ মনন
শ্রদ্ধার শিশির ভারে অবনত ঘাসের জীবন।

হয়তো আমার মনে সবুজের কোন রেখা পড়ে গেছে চোখে
পৃথিবীর সর্বসুখে দুখে
কখনো বা জনারণ্যে কখনো বা ঘুঘু ডাকা ধূসর দুপুরে।
আমারে যে ডাকে তাই অনবদ্য সুরে
দিবসে নিশায় তার সোনার নূপুরে।

একটি পাহাড়ী সন্ধ্যা

অজিতকুমার হাইত

বিকেলের ম্লান রোদ আকাশে মেলালো :

ঝাউবনী নদী-তীর ছেড়ে
দুধ-সাদা বলাকার দল,
নীলিম নিঃসীম বায়ে
মেলে দিল পাখা—
উদ্দাম-উধাও চঞ্চল।
সে পাখার আঘাতে আঘাতে
উড়ে যাওয়া পথরেখা ধরে
আঁধার পরীরা নেমে এলো।

আমার পাহাড়ী গ্রামে সাঁঝের ধূসর ছায়া নামলো॥

অচেনা গন্ধ

চার্লস্ বোদলেয়র

মুদিয়া নয়ন দুটি হেমন্তের তাপে ভরা রাতে
বাস নিই প্রাণভরে অনাবৃত তোমার বুকের,
স্বপ্ন তবে খুলে ধরে দেশ এক অপূর্ব সুন্দর,
অলস্ত রবির করে রাত দেশ আনন্দ-উজ্জ্বল।

অলস সে দ্বীপখানি স্বর্গের আনন্দ দিয়ে ভরা,
আশ্চর্য তরুণ দল, ফলগুলি অদ্ভুত-আস্বাদ,
পেশীময় পুরুষেরা, সবল বাহুল্যহীন দেহ,
স্বচ্ছ নয়নগুলি নারীদের আশ্চর্য্য উজ্জ্বল।

বুকের সুবাস তব নিয়ে যায় মোরে সেই তীরে
যেথায় মাস্তুল-পালে ভীড়-করা রয়েছে বন্দর,
এখনো মাস্তুল-পাল ক্লান্ত যেথা সাগর-দোলায়
অস্থির সাগর তার অশান্তিতে ভরেছে তাদের।

সবুজ তেঁতুলগুলি পাকে নাই এখনো সেথায়,
বায়ুরে উতল করি গন্ধ তার ভরে মোর বুক,
সেই গন্ধ উছলিয়া দেয়ে যায় মেশে অবশেষে
জাহাজীর গান আর সমুদ্রের বাতাসের সাথে।

অনুবাদ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাজধর্ম্মী সত্যেন্দ্রনাথ

কমলা দাশগুপ্ত

কবি-মানসের বিশেষ মুহূর্ত্তের আবেগ তাঁহার কাব্যরাশির মাধ্যমে স্ফূর্ত্তি লাভ করে আর এই আবেগ কবির মানসপ্রকর্ষণ ও জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ভাবনাধারণার উপর নির্ভরশীল—সেই জন্যই আমরা দেখি একই কালে একই সমাজে বাস করিয়াও কোন কবি কেবলমাত্র কাব্য-কাননের সুরচিত পুষ্পরাশির প্রতিই বিশেষ আগ্রহশীল আবার কেহ বা এই কাননের তুচ্ছতম তৃণটিকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বস্তু যাহাই হউক, ভাবকল্পনার ক্ষেত্রে যিনি যতখানি পাঠক-মনের চিত্ত-চমৎকার ঘটাইতে পারেন, তিনি তত সার্থক এবং তাঁহার কাব্যরাশি সমকালীন সমাজ ও মানবকে পশ্চাতে ফেলিয়া সর্ব্বকালীনতা ও সর্ব্বমানবতা, তথা বিশ্বমানবতার বিশাল রাজ-সভায় স্থায়ী আসন লাভ করে।

সত্যেন্দ্রনাথকে সাধারণতঃ "সাময়িক" কবি বলা হয়— ইংরাজীতে যাহাকে বলে "topical"। তবে কি তিনি সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশক মাত্র? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাঁহার কাব্য কখনও তো কাব্যসভায় স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে না—কেননা, সংবাদ সরবরাহকের আবার সর্ব্বকালীনতা কি? কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র "ঘটকালি করি শবদে শবদে বিয়া" দেন নাই কিংবা পংক্তির পর পংক্তি মিলাইয়া—সমসাময়িক সংবাদ সরবরাহ করেন নাই—তাহা করিলে তাঁহার কাব্য আমাদের নিকট এত প্রিয় হইতে পারিত না।

সত্যেন্দ্রনাথ যে সময়ে কাব্য-গগনে উদিত হন তখন দেশের ও দশের অবস্থা বা দুরবস্থা লইয়া কিছু রচনা করা একটা fashion ছিল এবং দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই হউক কিংবা স্বভাববশেই হউক সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া অনেকেই কাব্যনাটকাদি রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মূলগত ও গুণগত প্রভেদ অবশ্যস্বীকার্য্য।

জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে কাব্যের বিভিন্নরূপ আবেগ ও চরিত্র গঠিত হয় কিন্তু নিছক বাস্তব অভিজ্ঞতা তো কাব্যকঙ্কালে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারে না, ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র সীমানায় যাহা দিবাবাত্র সংঘটিত হইতেছে তাহা যতই না কেন বিরাট হউক তাহা সমসাময়িক মাত্র এবং তাহারই যথাযথ চিত্রায়ণ ফটোগ্রাফেরই নামান্তর; কিন্তু জীবনের সেই বিচিত্র সংঘটনকে যখন শিল্পী স্বীয় গভীর অনুভূতির দ্বারা তাহার ভিতরের সর্ব্বজনীন রূপটিকে বর্ণায়িত করেন তখন তাহাই প্রকৃত কাব্যপদবাচ্য হয় এবং তাহার আবেদন সর্ব্বমানবের মনে স্থায়ী আসন লাভ করে; এইখানেই সংবাদ সরবরাহক ও কবির মধ্যে গুণগত পার্থক্য। আর এই কারণেই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা নিছক "Local" হওয়া সত্ত্বেও "Universal"। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেরণা আলোচনা

করিলে আমরা দেখি যে তাহা সর্ব্বাংশেই তদানীন্তন সমাজ ও মানব জীবনের বিচিত্র ঘটনা সংঘটন।

স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে মন্তব্য করিয়াছেন—"সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য সেবার একটি নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ছিল।.....তাঁহার আদর্শ ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত—সেই আদর্শকে তিনি তাঁহার কবি-হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা ভাষায় ও ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

".....স্বদেশের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা ছিল। বর্ত্তমানের যাহা কিছু অধর্ম্ম ও অসত্য, যাহা কিছু ভীরুতা ও জড়তা, যাহা কিছু ক্ষুদ্রতা ও মূঢ়তা ছিল তাহাকেই কঠিন ধিক্কার দিতে ও বিদ্রূপ করিতে গিয়া তাঁহার বাণী বেদনার জ্বালায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত আবার অতীত ও বর্ত্তমানে যাহা কিছু সুন্দর ও মহান্ ভবিষ্যতে যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর হইবার সম্ভাবনা দেখিতেন, তাহাই তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিত এবং তাহার বন্দনা গানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন।"

সত্যেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থেই ইহার বহুল পরিচয় পাওয়া যায়। আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতবাসীর প্রতি শ্বেতাঙ্গের অত্যাচার, তাহাদের বর্ণ-বিদ্বেষ সুদূর ভারতীয় কবি তথা বাঙালী কবির মনে যে বেদনার দাবদাহ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই বহিঃপ্রকাশ "ইজ্জতের জঙ্গ" কবিতায় কবিহৃদয়ের হাহাকাররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবাসীর ইজ্জতের কথা মনে করিয়া তিনি চারণ কবি 'হালির' প্রখ্যাত রুবাইয়ের অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—

"ইজ্জৎ কী ভেদ মুলুক কা খিদ্‌মৎসে হ্যায় ছিপা।"
"হিন্দু তুমি হার মানিবে? হার মানিবে মুসলমান?
কর্ণ শিবি রাজার জাতি।...হাতেম তাইয়ের হে খাল্লাম!
হও গো সহায় তোমরা সবাই বিভেদ বুদ্ধি উচ্ছেদে,
ধর্ম্ম তোমার পক্ষে আছেন দাঁড়াও...বন্ধু বুক বেঁধে।"

কোন এক অজ্ঞাত পল্লীতে কোন্ এক পল্লীকুমারী পণের দায় হইতে তাহার পিতাকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য অগ্নিসংযোগে আত্মহত্যা করিয়াছে—তাহার সেই ক্ষুব্ধ হৃদয়ের হাহাকার ও তদানীন্তন সমাজের রূঢ় ও নির্ম্মম অত্যাচার দরদী কবির লেখনীকে পরম ব্যথার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"আগুনে সে প্রাণ সঁপেছে অগ্নিতেজা নিষ্কলুষ
মরেছে সে; বেঁচে আছে পুরুষ জাতির অপৌরুষ।

* * * *

মেহ যাদের দেহের ধাতু মমতা যার প্রাণের কথা
সঙ্কোচে সেই নারী মরে চক্ষে হেরে নির্ম্মমতা।
মনে মনে যাচ্ছে মরে কসাই হাটের কাণ্ড দেখে
শ্বশুর খোঁজেন বাপের মাল্য বাপের গলায় চরণ রেখে।"

পৃথিবীতে যে দেশে, যেখানেই এই 'কসাই-হাটে' পুত্র বিক্রয়ের অবৈজ্ঞানিক রীতি প্রচলিত আছে—বঙ্গ-তরুণের মাধ্যমে তাহাদের সকলের প্রতি কবির আহ্বান—

"অপৌরুষের শেষ-রেখাটি নিজের হাতে মুছতে হবে
কন্যাবলির এই কলঙ্ক লুপ্ত কর তোমরা সবে।

• • • •

সতীদাহ গেছে উঠে কন্যাদাহ থাকবে কি ?
রোগের ঋণের শেষ রাখনা, কলঙ্কের শেষ রাখবে কি ?"

জাতির পাঁতি কবিতায় সর্ব্বমানবের প্রতি কবির যে আহ্বান তাহা দেশকাল পাত্রের উর্দ্ধে শাশ্বত কালের মানবধর্ম্মের প্রতি শঙ্খনিনাদ। সমস্ত মানুষ এক—

"বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ, নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।"

ব্রাত্যের প্রতি ব্রাহ্মণের উদাসিক মনোভাব—এ যুগের সৃষ্টি মাত্র। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস হইতে তিনি যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া মুক্তিবাদীর মতই প্রমাণ করিয়াছেন—

"বংশে বংশে নাহিক তফাৎ বনেদী কে আর গরবনেদী
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ, দুনিয়া সবারি জনমবেদী।"

দুনিয়ার এই "জনম বেদীতে"—

"বাউরী, চামার, কেওরা, তেওর, পাটনী, কোটাল কপালী মালো,
বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর, তাঁতি, তিলি, মালি সমান ভালো,
বেনে, চাষী, ময়রার ছেলে, তামুলী, বারুই তুচ্ছ নয়,
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ, সকল জগৎ ব্রহ্মময়!"

ব্রহ্মময় এই জগতে মহামানবের মহাপূজায় প্রত্যেকেই অর্ঘ রচনা করিয়া একই উদ্দেশ্যে একই ভাবের পন্থা অবলম্বন করিয়া অতীত হইতে বর্ত্তমানে এবং বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতের পথে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে।

ইহা হইল সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রেরণার একটি দিক মাত্র। ইহা ছাড়া তাঁহার কবিধর্ম্মের আর একটি দিক আছে—তাহা কবির স্বাজাত্যাভিমান তথা স্বজাতিপ্রীতি এবং স্বদেশের প্রতিটি ব্যক্তি, দেশের নদনদী গিরি এমন কি তুচ্ছতম ধূলিকণাটির প্রতিও কবির সহমর্ম্মিতা, ইহার পরিচয় পাই তাঁহার চরিত্র কবিতাগুলিতে। রাজর্ষি রামমোহনের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে গিয়া কবির মনে হয় রামমোহন দেহধারী নরমাত্র নন—তিনি সত্যনিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং

"বেদান্ত কোরাণ বাইবেলে
মিললে তুমি হে অবহেলে।"

'দিগ্বিজয়ী' ও 'আদ্যাদায়িক' কবিতাদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথকে তিনি কেবলমাত্র সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি মনে করেন না—রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ে তাঁহার রঘুর দিগ্বিজয়, শঙ্করাচার্য্যের তর্কযুদ্ধে দিগ্বিজয়ের

কথা মনে পড়ে। বাংলার অগভীর দীঘিকায় যে সহস্রদল পদ্ম বিকশিত হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র বাংলার প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে বরং—

"পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্ত্তা ছোটে;" এবং

"জন্ম যাহার শান্ত জলে সুপ্তলহর স্নিগ্ধবাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে।"

'মনীষীমঙ্গল' কবিতায় বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে "সত্যপথযাত্রী" বলিয়া তিনি প্রণাম জানান। মহাকবি মধুসূদন তাঁহার চক্ষে মহাবল বিদ্রোহী কবি কেননা উদ্ধত বিদ্রোহ ভরে তিনি কবিতায় মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খল ঘুচাইয়া অমিত্রাক্ষরের কিঙ্কিণী পড়াইয়াছেন। "দেশবন্ধু" দীনবন্ধু মিত্র যদিও নট ছিলেন না তথাপি নাট্যকাররূপে তিনি নীলকর বিষধর উদ্গারিত গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের উপাধিতে তিনি বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান ও ধ্যানের ত্রিবেদী আবিষ্কার করিয়াছেন। বিধর্ম্মী নাস্তিক David Hare তাঁহার নিকট আস্তিকের গুরু।

বাংলা প্রকৃতির বর্ণনায় বর্ষার রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে 'হুল্‌শে গুঁড়ি' কবিতায়। কবিধাত্রী বঙ্গভূমি তাঁহার জীবনপালিনীই নহেন—তিনি মূর্ত্তিমতী দেবী। বস্তুতঃ বঙ্গ প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুর শোভা তাঁহার গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি কবিতার প্রতিটি সূত্রে বিলসিত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু মাত্র তাহাই নহে বঙ্গমাতা কবির বেদমাতা, এবং বঙ্গ প্রকৃতির মতই কোমলে কঠোরে সমন্বিতা মাতৃমূর্ত্তি—

"ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী—
তুই গো ভীমা, তুই গো শ্যামা অন্তরে তোর রাজধানী।"

সত্যেন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ যে কত প্রবল ছিল—দেশের প্রতিটি ঐতিহাসিক রাত্রির প্রতি তাঁহার গর্ব্ব যে কতদূর ঐকান্তিক ছিল—দেশের ধূলামাটির প্রতিও তাঁহার আকর্ষণ যে কত প্রগাঢ় ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবির সমুদ্র বিষয়ক কবিতাগুলির মাধ্যমেও। স্বদেশ হইতে বহুদূরে উড়িষ্যার উপকূলে সমুদ্রের ধ্যানগম্ভীর, অথবা উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া একদিকে যেমন তাঁহার মনে ভীতি ও আনন্দের মিশ্রভাবের সঞ্চার হয় অপরদিকে তেমনি এই মহাসমুদ্রের সহিত সম্পৃক্ত বাঙ্গালীর দেশ বিজয় কথা বাঙ্গালীর সমুদ্র বিজয় কথা মনে করিয়া গর্ব্বে তাঁহার বক্ষ স্ফীত হয়। সমুদ্র সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির মধ্যে কবিমনের একটি গূঢ় দর্শনতত্ত্ব প্রকাশ পাইলেও এখানে বাঙালী সুলভ মননশীলতার অভাব নাই। পূর্ণিমা রাত্রে জ্যোৎস্নাচন্দনের পত্রলেখায় সুশোভিত অভিসারক সমুদ্রকে দেখিয়া গৌরাঙ্গের মতই তাঁহার সমুদ্রকোলে স্থান লাভ করিতে ইচ্ছা করে। সমুদ্রকে কবির ভীতিপ্রদ মনে হয় না, কেননা তাঁহার মনে হয়—

"এই সমুদ্র বশে এনে বঙ্গ যুবরাজ
বিজয় সিংহ পরেছিলেন সম্রাটের তাজ।"

ঢেউয়ের বর্ণনায় যেমন গম্ভীর ও মহৎ ভাব-কল্পনা আছে, তেমনি আছে বাংলার কামারশালের হাপরের শব্দের প্রতিধ্বনি। ঢেউয়ের সাথে সাগরিকার ভেলা যেমন নিমজ্জিত হয় তেমনি

"কঙ্কাবতীর নৌকাটি এবং লেবুফুলের গের জড়ানো গলুইটা" ইস্তক তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হয় না। "মহানদী" "রূপনারায়ণ" "চট্টলা" প্রভৃতি কবিতায় কবিমনের একটি বিশিষ্ট ভাব-কল্পনা রূপ পাইলেও সর্ব্বত্রই দেখি তাঁহার বাঙালীমনের অনুভূতিপূর্ণ প্রাণসত্তা।

বস্তুতঃ সত্যেন্দ্রনাথের কবিকর্ম্মে শুধুমাত্র বাঙালী সমাজই নহে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস, বাংলার যশোগাথা, বাঙালী জীবনের জয়পরাজয়, উত্থান-পতন, বাংলার নগরী-পল্লী সমস্ত কিছুই কবিমানসে প্রতিভাত হইয়া যে বর্ণসুষমা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রেরণা আপাততঃ সাময়িক হইলেও রস-সংবেদনায় তাহা চিরন্তনী, ইহাই artistic significance এবং ইহাকেই জাঁ পল্ সার্ত্র্ বলিয়াছেন Existence is prior to essence—অস্তিত্বই আমাদের সত্তার পুরোধা এবং এই artistic significance ও Existenceএর বিচারে সত্যেন্দ্রনাথ সমসাময়িক বা topical হইয়াও সর্বকালের—eternal।

সুসান

অমল দত্ত

পার্কসার্কাস ট্রামে অফিসযাত্রীদের ভীড়ে সুসানকে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। চলবার ব্যস্ততা তার নেই, এত ঠেলাঠেলিতেও সহজ আনন্দে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখের সামনে মেলে ধরে প্যাঙ্গুইন মার্কা একটি বই।

আমিও যাত্রী, একই স্থানে উঠি—নামি সুসানের আগে। সুসান বই হাতে দাঁড়িয়েই থাকে। মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি মনে হয়।

পরিচয়ও ঐ জন্যে ঘটে গেল।

একদিন নামতে নামতে বল্‌লাম, তুমি বোধহয় এখানেই নামবে?

সুসান ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে, তাই তো—এসে গেছি!

নেমে চারদিক তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, তুমি এমন জোক করলে কেন? আমি তো পরের ষ্টপে নেমে থাকি।

—কী করে নামবে, তুমি কি দেখতে পাও?

—কেন আমি কি অন্ধ?

—প্রায়। চোখের সামনে বই রেখে তুমি কী করে জানবে জায়গায় পৌঁছে গেছ!

—ও গড! তোমার আন্দাজ আছে।

—তা হলে ওটা বই পড়ার ভান। তোমরা বড্ড ফ্যাশানে চলো—ও জন্যেই তোমাকে শাস্তি দিইছি।

সুসান এবার হেসে ফেললে, তুমি ভারী মজার লোক। ইণ্ডিয়ানদেরও ফ্যাশান আছে, তোমরা মেয়েদের 'পর বড় নিষ্ঠুর হয়ে থাক। আমাদের জাতের লোক হলে এক ষ্টপ এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করতো।

একটু জব্দ হলাম। সামনে যেতে যেতেই কথা চলছিল, আরেকটু এগিয়ে বললাম, আরেক-দিনের জন্যে ও ভদ্রতাটুকু মুলতুবী রইল, এবার না ফিরলে অফিস কামাই করতে হবে।

তারপর হেসে বিদায় নিলাম—ইণ্ডিয়ান বলে তো জাত নেই। জাত মেয়ে আর পুরুষ। আজকে তার প্রমাণ হলো না কি!

বেশ কিছুদিন সুসানের সঙ্গে দেখা হলো না। নিতান্তই ট্রামের কারসাজি, ঘড়ির গণ্ডগোল। একদিন বিকেলে পায়ে হেঁটে এক বন্ধুর বাড়ীতে যাচ্ছি তাসের আড্ডা জমাবো বলে, দূর থেকে দেখি

সদলবলে সুসান এগিয়ে আসছে। সুসানের হাতে ফুটবল, পরণে কালো হাফপ্যাণ্ট, গায়ে হলদে গেঞ্জি। অন্য মেয়েদেরও তা-ই।

সুসানের যৌবন-উচ্ছলিত দীর্ঘ তনু গতিভঙ্গিতে নৃত্যপরা, মসৃণ, জানু ও জঙ্ঘা ছলকে ছলকে উঠছে, সুডৌল নিতম্ব তরলা তরঙ্গের সৃষ্টি করছে, গেঞ্জির খোপ হতে দু'টি 'বউ কথা কও' পাখি আকাশে উড়তে চাইছে। সুসান আমাকে দেখে লজ্জায় চঞ্চল হয়ে উঠল। ফুটবল দিয়ে শরীরের কোন অংশ ঢেকে রাখবে ঠাহর করতে পারছিল না। হঠাৎ ফুটবলটা তার হাত থেকে খসে পড়ে সামনের দিকে লাফাতে লাগল।

আমি কুড়িয়ে নিয়ে সুসানের হাতে তুলে দিতে চাইলাম। সুসান রাঙা মুখে নীচের দিকে তাকিয়ে ছিল, আরেকটি মেয়ে ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে ফুটবলটা নিয়ে অস্ফুটস্বরে বললে, ধন্যবাদ।

সুসানের সামনে দাঁড়িয়ে আমিও যেন সহজ হতে পারছিলাম না, একটু উত্তাপ মিশিয়ে শুধালাম, তা হলে দু জাতের কথাটা ঠিক নয়, তিন জাতের লোকই আছে—মেয়ে, পুরুষ আর যারা মেয়ে নয় পুরুষও নয়!

সুসান সেভাবে তাকিয়েই মৃদু হেসে বললে, তৃতীয় জাতের লোক একজন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

—ও, কী দুষ্টু মেয়ে!

সুসান উচ্চহাসির ঝিলিক মেরে হরিণীর মত ছুটে চলে গেল,—তাহলে আমার কথাও প্রমাণ হয়ে গেল?

পরদিন সুসানকে ধরবার জন্যে একটু আগে এসেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু ধরা গেল না। অনেকগুলো ট্রাম ছেড়ে চলে গেল। এক সময়ে দেখলাম পরের স্টপ থেকে সুসান মন্থর গতিতে ট্রামের ভেতর ঢুকে গেল।

নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হলাম। একটি অপরিচিতার প্রতি অহেতুক কৌতূহলে এমন সস্তা হবার কোন মানে হয় না—বিশেষ সে যখন এড়িয়ে যেতে চায়।

ক্ষুব্ধ হলাম। অফিসের কাজেও ঝামেলা হলো। ছুটির সময়ে ঝম ঝম বৃষ্টির তোড়ে যখন ড্যানহৌসী স্কোয়ার ভেসে যেতে লাগল, সেই দিনটির অকারণ নিষ্ঠুরতায় মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল। বেপরোয়া হয়ে রাস্তায় নেমে এলাম—বাড়ীতে গিয়ে চান করে বই হাতে বিছানায় না শোয়া পর্য্যন্ত আজকের দুর্ভাগ্য কাটবে না।

হঠাৎ পেছন থেকে শুনলাম, মেয়েলি গলায় কে চেঁচাচ্ছে,—হ্যালো বাবু, হ্যালো বাবু।

বৃষ্টিতে রাস্তা থৈ থৈ করছে, কড়া বাতাস গুমরে গুমরে উঠছে—ট্রামগুলি সব শাঁখের মালার মতো লালদীঘি জড়িয়ে আছে, মোটর গাড়ী আর যাত্রীর বাস জল ছিটকে বেগে ছুটে চলে যাচ্ছে।

যেন প্রচণ্ড আর্ত্তনাদের রোল উঠছে। মনে হলো মেয়েটিও এই ঝঞ্ঝা বিক্ষোভে দিশেহারা হয়ে পড়েছে—ফিরে তাকালাম।

তীব্র জল বর্ষণ ধূসর চিকের মত চারিদিক ছড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে বাতাসের ঝটকায় বাষ্পের ধোঁয়া ঘোট পাকিয়ে উপর দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটিকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না, ছাতা মাথায় ছুটে আমার দিকে আসছিল। একবার হাত তুলে দাঁড়াবার ইঙ্গিতও করলে।

চমকে উঠলাম, নিশ্চয়ই সুসান হবে।—পাতলা ওয়াটার প্রুফ আপাদমস্তক আবৃত ছাতা উঁচিয়ে সুসান ছুটতে ছুটতে আমার সামনে এসে হাঁপাতে লাগল।

—বাবু, তুমি কি কানেও শোনো না, চোখেও দেখো না?

—রাস্তায় এত বাবু থাকতে কী করে বুঝবো তুমি আমাকেই ঠিক ডাকছ।

—তোমা'র মতো রাস্তায় কে হাঁটছে! ইস্, একেবারে ভিজে গেছো, নাও ছাতাটা মাথায় দাও—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ছাতাটাও নিয়ে এসেছিলাম।

—ছাতা দিয়ে আর কী হবে, ভিজেই তো গেছি।

—বাবু, তুমি বড় সেন্টিমেণ্টাল—

ছাতাটা হাতে নিয়ে ওকে বাধা দিয়ে বললাম, প্লীজ, খালি বাবু বাবু করো না। আমার নাম মণি রায়—তুমি আমাকে মণি বলে ডেকো।

—ও রয়, আমাদের অফিসেও রয় আছে, তিনজন রয়।

—মণি নেই তো, তুমি আমার নাম ধরে ডেকো।

—আচ্ছা। তোমার জন্মদিনে আমার কনগ্রাচুলেশন মণি!

—আমার জন্মদিন?

সুসান খিল খিল করে হেসে উঠল, হ্যাঁ—নইলে এমন দুর্য্যোগে কেউ রাস্তায় বের হয়? এই দেখনা, আমি একটু আগে ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলাম—জন্মদিনের উৎসব রয়েছে। আমার জন্যে 'মামি' ভালো কেক কিনেছে। বারে বারে বলে দিয়েছে, সুসান ভীড় হবার আগে চলে আসবে, তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করবো।

—সুসান!

—ও তোমাকে আমার নাম বলা হয়নি—আমার নাম সুসান। কেউ ডাকে সুসি—কেউ ডাকে সু—'মামি' কেবল ডাকে সুসান।

—আমার কনগ্রাচুলেশন সুসান, এমনি করে তোমার জন্মদিনে যেন আমাদের আরো দেখা হয়। এবার চলো একটা ট্যাক্সী করে তোমায় বাড়ী পৌছে দিই—

হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসপ্লানেডের কাছে এসে পড়েছিলাম। সেখানে অনেকগুলি ট্রামগাড়ী অচল হয়ে আছে। কয়েকটা ট্যাক্সী ছুটোছুটি করছে নজরে এল। সুসান আগ্রহভরে ওদিকে একবার তাকিয়ে শুধু মুচকি হেসে বললে, তোমাকে তো আমার বাড়ীতে নিতে পারবো না, মণি।

—তোমার বাড়ীতে আমি ঢুকতে চাইনে, তুমি নেমে যাবে—আমি চলে যাব আমার বাড়িতে।

—না মণি, তা হয় না। বৃষ্টি কমে এসেছে, এক্ষুণি ট্রামগাড়ি চলতে শুরু করবে।

—তা হলে চলো কোথাও গিয়ে বসে একটু চা খাই।

—কিন্তু 'মামি' যে অপেক্ষা করে বসে আসে। শুনলে দুঃখিত হবে।

—সব কথাই কি তোমার 'মামি'কে গিয়ে বলতে হয়?

—তা নয়। আজ আমার জন্মদিন।

এসপ্লানেডে একটা গাড়ী-বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালাম। বাতাসের ঝাপটা কমে গেছে, বৃষ্টিও ঝিমিয়ে এসেছে। সুসান উদাসভাবে দূরে তাকিয়ে আছে।

—তোমার জন্মদিনে ঝড় নিয়ে এলে, সুসান! জানিনা এ ঝড় কোথায় থামবে। তোমার 'মামি' নয়—কারো মনে নিশ্চয়ই এ ঝড় বইছে।

—দুষ্টু। সুসান মৃদু হাসলে।

—মেয়েদের দোষ কি জানো! তারা ইচ্ছে করে একটা রহস্যের তকমা এঁটে থাকে। তুমিও তাই।

সুসান হেসে বললে, কী বিপদ জানো, মণি, আবহাওয়া অফিসের মতো তোমরা আন্দাজে একটা ধারণা করো। গাড়ি চলছে, এবার আমি চলি।

—আচ্ছা। আমাকে যা সাহায্য করলে তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ।

—তাহলে আমাকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। আপাতত ওটা চাপা থাক—ঐ গাড়িটা আমাকে ধরতে হবে। বাই, বাই।

সুসান ছুটে চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম পার্কসার্কাসের পরের গাড়িটি ধরবো বলে।

পরদিনও সুসানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চোখভরা তার কৌতুকহাসি। আরো দুজন যাত্রিনীর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। ট্রামে উঠে প্রথামত একটি বই খুলে চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখলে। শুধু আমার নামবার আগে দু'বার তাকিয়ে দেখল। মুখে হাসি টেনে।

আরেকদিন ট্রামে উঠছি, দেখলাম সুসান ছুটতে ছুটতে আসছে—বেল বাজিয়ে ড্রাইভারকে ধমকে গাড়িটা থামালাম। সুসানকে একরকম টেনে তুলে নিলাম।

—ধন্যবাদ।

আস্তে আস্তে শুধালাম, আজকে বুঝি ঘড়িটা বন্ধ ছিল?

—না। ঘরের কাজে আটকে গেছলাম। মণি, লাইটহাউসে একটি ভালো ছবি এসেছে—দেখবে না?

—তুমি যদি যাও—তাহলে যেতে পারি।

—আমি একবার দেখেছি। আজকে রাত্তিরেও যেতে পারি। ছবিটা দেখলে খুশী হবে।

—আচ্ছা।

রাত্তিরের শো'তে লাইটহাউসে গেলাম। একটি বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর জীবন অবলম্বনে ছবি।

'লবী'র চিত্রাবলী দেখলেও মনটা নেচে ওঠে। মনে হল সুসান আর আসবে না—টিকিট কেটে রাস্তার সামনে এলাম চোখ বুলিয়ে নিতে। পর পর গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে—সুসজ্জিত নরনারীর ভিড়, সর্বদেশের সর্বজাতের। একটা বিরাট বুইক চকচকে ঝকঝকে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতর থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো হাসির আবির চুরুটের ধোঁয়ায় মিশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল। ডিনারের পোষাকে কয়েকজন মেয়েপুরুষ নামল, তাদের মধ্যে সুসানও ছিল—এবং কোন দিকে না তাকিয়ে আরো হাসি ও আরো ধোঁয়া ছড়িয়ে তারা ভেতরে চলে গেল। যে লোকটি সুসানের কোমর জড়িয়ে পাশাপাশি চলছিল, তাঁর চোখে মুখে সর্বত্র বিলাসের ছাপ—তার গাম্ভীর্য ও পৌরুষ আমাকে ঈর্ষিত করে তুললে।

ছবি আরম্ভ হবার পর অন্ধকারে আমি জায়গায় গিয়ে বসলাম। এবং শেষ হবার আগেই বেরিয়ে শেষ ট্রামটি ধরবার চেষ্টা করলাম। ইচ্ছে ছিল সুসানকে নিয়ে ট্যাক্সীতে বাড়ি ফিরবো।

কয়েকদিন আর সুসানের সঙ্গে দেখা হলো না। একদিন ছুটির পর সুসানকে ট্রামে দেখতে পেলাম বান্ধবীদের সঙ্গে গল্পে মশগুল, আমাকে যেন দেখেও দেখল না। পার্কসার্কাসে নেমে অনর্থক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বললে। আমি বিরক্ত হয়ে চলে গেলাম।

আরেকদিন ট্রামে সুসানের দেখা পেলুম অফিসের পথে। আমি দৌড়ে এসে উঠেছিলাম, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তাই পাদানিতে ঝুলে থাকা যাচ্ছে না—ভেতরে ঠেলে ঢুকে দেখি সুসান নিশ্চিন্ত মনে বই পড়ছে। অনেকদিন ধরে বিরক্তি জমে উঠছিল, যতটা সম্ভব ঠেলেঠুলে দূরে চলে গেলাম। সুসান বই থেকে মোটেই চোখ তুললে না।

অফিসের সামনে এসে নামতে যাব, সুসান আমার কাছে ঘেঁসে বললে, তুমি পরের ষ্টপে নামবে।

—আমার সময়ে কুলোবে না।

—প্লীজ।

অগত্যা একসঙ্গেই নামলাম। সুসান হেসে বললে, আমাকে অফিসের দরজার কাছে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

—তার মানে সেদিনের শোধ তুলছো?

—না, প্রেমের পরীক্ষায় তুমি নম্বর পাবে না। মেয়েদের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় তা-ও জানো না। মেয়েদের যদি একটু তত্ত্বতালাসি না করো, তাদের মন ভিজবে কেন।

—থাক, আমার দরকার নেই।

—ও, বিয়ে হয়ে গেছে বুঝি? সরী, আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।

—বিয়ে করি নি। সেদিন লাইটহাউসে তোমার প্রেমিকটিকে দেখার পর আমার আর তোমার সম্বন্ধে উৎসাহ নেই।

সুসান খিল খিল করে হেসে উঠল: ও ডিয়ার, ডিয়ার।

সুসানের অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। একটা গাড়ি এসে থামল, এবং লাইট-

হাউসের সেই প্রেমিকটি ত্রস্তে বেরিয়ে দ্রুত বেগে অফিসের দিকে ছুটে চললো,—হ্যালো সুসি!

—গুড মর্নিং স্যর!

— মর্নিং।—ভদ্রলোক ছুটে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

সুসান হেসে বললে, আজ শনিবার—আমাদের ছুটোয় ছুটি হয়ে যাবে। তোমার জন্যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো।

—আমার জন্যে!

—অত নার্ভাস হয়ো না। প্লীজ, চলে এস!

বেশ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডা আবহাওয়া। সুসান আমার জন্যে অপেক্ষা করবে ভাবতেও আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল। শনিবারের অফিস, এমনিতে পালাই পালাই রব আছে। আমি খালি ঘড়ি দেখছিলাম।

সুসান ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, দশ মিনিট লেট। তুমি নিশ্চয়ই বাড়ি ঘুরে এসেছো!

—মোটেই না।

—তোমাকে বেশ তাজা দেখাচ্ছে যে!

—ও রকম কেউ অপেক্ষা করলে তাজা হতে কতক্ষণ।

—দুষ্টু ছেলে। চলো। আজকে ডিনারের আগ পর্যন্ত আমি তোমার কেয়ারে। বাড়ি থেকে ছুটি নিয়েছি।

—বলো, কোথায় যাবে।

—প্রথমে বুফে—তারপরে ইডেন গার্ডেন—তারপরে, ওটা পরেই না হয় ভাববো। তোমার সঙ্গে টিকতে পারলে তো।

—আশা করি পারবে। একটা ট্যাক্সী—

—না হেঁটে যাব। কেমন মিষ্টি জল পড়ছে, বেশ মজা হবে।

ট্র্যাণ্ড রোড ধরে চলেছি। কুয়াশার মত বৃষ্টি পড়ছে—সুসানের ছোট ছাতার তলায় কোনো রকমে দুটো মাথা একত্র রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে আর সুসান হেসে উঠছে।

—মণি, তোমার মাথা বেশ শক্ত আছে।

—মগজ ছাড়া কিছু নেই কী না।

—উঁহু। মগজ তো তরল পদার্থ। আমার মনে হয় সিমেন্টে তৈরী।

—মাকে জিজ্ঞেস করে দেখব।

—মা কি আর জানে, তোমার মেয়েদের পাল্লায় পড়ে অমন হয়েছে।

—মেয়ের পাল্লায় তো এই প্রথম—

—সে কি, কাউকে কোনোদিনও ভালবাসনি? তা হলে কী নিয়ে বেঁচে আছো!

—তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি!

—পুওর চ্যাপ। সমস্ত ভালোবাসা তোমার সিমেন্ট হয়ে গেছে!—সুসান খিল খিল করে হেসে উঠল। এতক্ষণ দু'জনেই ছাতার ডাঁটে হাত রেখে চলছিলাম, এবার সুসান বাঁ হাত দিয়ে আমার ডানবাহু আকর্ষণ করে ঠুক করে মাথা ঠুকে দিয়ে আরো জোরে হাসতে লাগল।

এ হাসি ছোঁয়াচে। আমার অন্তরেও উল্লাসের ঢেউ খেলে গেল। বাইরের পরিবেশে ঝির ঝির বৃষ্টি রাস্তায় আরশির চকমকি এনে দিচ্ছিল—গঙ্গার পাশের বড় বড় ইমারতগুলি কৌতুকোচ্ছল বলে মনে হচ্ছিল। বললাম, জানো সুসান, রবি ঠাকুরের একটি কথা আমার একলা ঘরে মাঝে মাঝে মনে পড়ে—'ঘরে বসে আছি ভরা মন নিয়ে, দিতে চাই নিতে কেহ নাই'!

—আহা ট্যাগোরের কথা! কী সুন্দর, আর কত সত্য! মণি, তুমি ও কথাটা আমাকে লিখে দেবে।

সুসান হঠাৎ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠল। বুফে-তে গিয়ে চা-প্যাষ্ট্রীর অর্ডার দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কাগজ কলম বার করে আমার হাতে দিয়ে বললে, নাও, লিখে দাও!

অবাক হয়ে শুধালাম, সুসান, এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?

—আহা কত বড় খাঁটি কথা ট্যাগোর বলেছেন! জীবন দিয়ে তার অর্থ বুঝতে হয়। মণি, আজ তোমার সঙ্গে আসা আমার সার্থক হয়েছে।

—ধন্যবাদ।

—ট্যাগোরের বই আমি পড়েছি, মহাত্মার বই আমি পড়েছি—আমার মনে হয়েছে এই দেশ আমার দেশ। কিন্তু সে কথা কাউকে বলতে পারি নি, তোমরা আমাদের অপমান করো।—

—আমরা মনে করি তোমরা দয়া করে এখানে আছো, সুযোগ পেলেই বিলেত চলে যেতে চাও।

সুসান মৃদু হাসল, সত্যি তাই? দেখ তো কতটা ভুল বোঝাবুঝি!

চায়ে চুমুক দিয়ে আরাম পেলাম। জামা কাপড় একরকম ভিজে গেছে—কিন্তু সুসানের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, চাপা গলায় একটা সুরের রেশ টেনে চলেছে। গঙ্গার উপরে ফেরি ষ্টিমারগুলি হুস হুস শব্দে জল কেটে উধাও হয়ে যাচ্ছে, জেটিতে মালটানার শব্দ। এর মধ্যে একটি বিদেশী জাহাজ ভোঁ শব্দে আমাদের চায়ের পেয়ালাগুলি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিলে।

—যাই তোমায় বলি সুসান, জাহাজের আওয়াজ শুনলে আমারও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

—চলো না পালিয়ে যাই।

—চলো। কিন্তু কোথায় যাব?

—বাস, মণি, আর পারলে না। পালাতে গিয়ে যদি ভাবো কোথায় যাই, তাহলে পালানো হয় না—টম বলে আমার একটি বন্ধু হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেল, পরে জানা গেল ইরাকে অয়েলকোম্পানীতে কাজ করছে।

—হ্যাঁ সব সম্বন্ধ চুকেবুকে যেতে হয়।

—এক জায়গায় সম্বন্ধ চুকবে, আরেক জায়গায় গড়ে উঠবে!

—তুমি বিশ্বাস করো, সুসান?

—তা না হলে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে এক জাতের সৃষ্টি হতো না।

—তোমরা তা হলে সুখী?

—নিশ্চয়ই, শুধু তোমরা আমাদের একঘরে করে রেখেছ।

—রাখিনি—তার প্রমাণ এখানে আছে। আমি সুসানের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলাম।

—ওটা পার্টিকুলার কেস, জেনারেল নয়।

—যাক বরফ ভাঙছে তো? তা হলে দেরী হবে না।—হঠাৎ যেন ইতিহাসের পাতাগুলি আমার চোখের সামনে নেচে উঠলো। সুসানের দিকে চেয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বললাম, ভারতবর্ষে যা জাতির সংমিশ্রণ হয়েছে, তা আর কোনো দেশে হয় নি। সুমেরিয়ান, এসিরিয়ান, মঙ্গোলিয়ান, তুর্কী শক হুণ প্রভৃতি এখানে এসে এক মহাজাতি হয়েছে। তাদেরই বংশধররা ইয়োরোপ থেকে এসে কয়েক শতাব্দী আগেও খাঁটি ভারতীয় হয়ে গেছে। এই মাটির সমস্ত গুণ যদি তুমি গ্রহণ করতে পারো, তা হলে তুমি একঘরে হয়ে থাকবে না। তোমাদের পোষাক চলাফেরা আচার খাওয়া দাওয়া সবই এদেশের আবহাওয়ার প্রতিকূল। আমার জানা কয়েকটি পরিবারে ইংরেজ ও জার্মেণ মহিলা বাঙালী বিয়ে করে একেবারে এদেশের হয়ে গেছে। তাদের রঙ তোমাদের চেয়ে অনেক সাদা—কিন্তু তোমরা নদীর চরার মতো মাথা তুলে আছ।

—সে জন্যে আমার মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসে, মণি! তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমি যেন একটু বাইরের বাতাস পেয়েছি। কিন্তু তবু কি জানো, আমি অনেক বাঙালী বাবুকে জানি যারা আমাদের সস্তা মনে করে।

কথাটা বলতে সুসানের যেন কুণ্ঠায় গলা আটকে এল।

বুকে থেকে নেমে আমরা ইডেন গার্ডেনে এসে পৌছুলাম। বৃষ্টি নেই। ভেজা সোঁদা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। গাছগাছড়ার আড়ালে সুসান খুশী মনে গাইতে শুরু করেছিল। হঠাৎ সামনের একটি বেঞ্চে ছাতা ও ভ্যানিটি ব্যাগটা রেখে ছুটতে ছুটতে বললে, মণি, পারো তো ধরো।

লুকোচুরি খেলায় সুসানের সঙ্গে পারা মুশকিল। যতবার ওকে ধরতে যাই, রাবারের মতো শরীরটা মোচড় দিয়ে সটকে দূরে চলে যায়।

শেষটায় একটা ছোট্ট ঝোপের দু'পাশে এসে আমরা দাঁড়ালাম। সুসানকে একবার প্রায় ধরে ফেলেছিলাম, কড়ে আঙুলের ধাক্কা দিয়ে সে ঘুরে গেল। চরকির মতো ঘুরছি—শেষটায় পেছন থেকে সুসান আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হাসতে লাগল, মণি, হেরে গেলে!

—আচ্ছা ড্র, চলো এবার গিয়ে বসি।

বেঞ্চে বসে মাথা এলিয়ে পা দুলিয়ে সুসানের আবার গান শুরু হলো—বিলিতি গান আমার খুব ধাতস্থ হয়না, তবু সুসানের গলায় যেন রমণীয় লাগল।

—এ গানটা গাইলে আমার মেরীর কথা মনে হয়। ইস্কুল ছুটির পর এখানে এসে আমরা এ গানটা গাইতাম। এক অষ্ট্রেলিয়ানকে বিয়ে করে মেরী চলে গেছে পার্থ। আর দেখা হবে না।

—তুমি দূরে যেতে চাও না, সুসান?

—আমার ভাগ্য যদি টানে।

—তোমার 'মামি'কে ছেড়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না। তুমি বোধহয় এখনো খুব আবদার করো?

সুসান খিল খিল করে হাসে।

শুধালাম, বাড়ীতে আর কে কে আছেন?

—তোমার জন্যে শুধু আমিই আছি।

—বুঝেছি।

—এই ছাখো মণি, আবার সেন্টিমেন্টাল হচ্ছো! নিষ্ফল কৌতূহল যে ভালো নয়—তা তুমি বুঝতে চাও না।

—চলো, আরেকটুকু চা খাওয়া যাক!

—চলো, লেক ক্লাবে যাব। আমি সাঁতার কাটব, তুমি চা-টা খাবে। আজ বেদিং কষ্টিউম সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

সাঁতারের পোষাক পরে সুসান ছুটে এসে শুধাল, কেমন মানিয়েছে বলো! খুব খারাপ লাগছে কি?

—চমৎকার! আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে।

—ডোণ্ট বি সিলি! চলো, আমার সাঁতার কাটা দেখবে।—সুসান আমাকে টেনে নিয়ে এল জলের ধারে।

জলে নেমে সুসান ছোট্ট খুকীর মতো দাপাদাপি শুরু করে দিলে। জলের মাদকতা আছে, সাঁতারদের মধ্যে বয়েসের তারতম্য বোঝা যাচ্ছে না। সলজ্জ বাঙালিনীরাও কম হুটোপাটি করছে না।

এক সময়ে সুসান আমাকে লক্ষ্য করে জল ছিটোতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরাও চিৎকার করে মহোল্লাসে আমার জামাকাপড় ভিজিয়ে দিলে। আমি পালিয়ে বাঁচলাম।

সুসান জল থেকে উঠে এসে বললে, চলো, তোমাকে আজ মেম্বার করে নেব। এখানে এসে সাঁতার কাটবে। খালি খালি স্বপ্ন দেখো—একটু জীবনটা উপভোগ করো।

—ছাখ, কোট প্যাণ্ট ভেজা থাকলে মনে হয় লোকটা জাহাজডুবি হয়ে বাড়ি ফিরেছে।

কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবী ভেজা দেখলে সবাই ভাবে, কোথাকার এক হতভাগা ড্রেনে চুবুনি খেয়ে এসেছে। আজ থাক আরেকদিন তোমার সঙ্গে এসে মেম্বার হয়ে সোজা জলে নেমে যাব।

—তাহলে তুমি একটা ট্যাক্সী করে সোজা বাড়ি চলে যাও। আমি এক বান্ধবীর সঙ্গে পরে যাচ্ছি।

—আমিও তো তোমায়—

—মণি, প্লীজ, কথার অবাধ্য হয়ো না। ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে। বাড়ি গিয়ে কতক্ষণ গরম জলে পা ডুবিয়ে রেখো!

আবার কয়েকদিনের জন্যে সুসানকে খুঁজে পেলাম না।

পনেরোই আগষ্ট, স্বাধীনতা দিবস। অফিস বন্ধ। আরামে আয়াসে দেরী করে ঘুম থেকে উঠে চা-খাবার খেয়ে ধীরে সুস্থে বেরোলাম সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে। দূর থেকে দেখি ট্রামের ষ্টপে সুসান দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে একজন মধ্য বয়েসী ফ্যাকাসে চেহারার প্যাণ্টকোটধারী ভদ্রলোক এবং দুইটি বাচ্চা ছেলে। সুসান সুসজ্জিতা, ছেলেটিরও ভালো পোষাক—মাথায় রঙিন টুপি। ভদ্রলোকের বাটন হোলে একটি গোলাপ গোঁজা।

কাছে এসে সুসানকে দেখে হাসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সুসান মোটেই তাকাল না। একটি খালি ট্রামে ওদের পেছন পেছন আমি উঠলাম। সুসান আমার দিকে পেছন ফিরে ছেলে দুটিকে নিয়ে বসল। স্পষ্ট কানে এল ওরা 'মামি' 'মামি' ডেকে সুসানকে কী দেখাবার চেষ্টা করছে। ভদ্রলোক চারটে টিকিট কাটলেন—সুসান আজ ট্রাম পাশ নিয়েও বেরোয়নি।

ওয়েলেস্‌লির মোড়ে তারা ট্রাম থেকে নেমে গেল। সুসান ছেলে দুটিকে নিয়ে আগে এবং ভদ্রলোক পেছন পেছন চললেন।

সুসান মাথা নুইয়ে ছেলেদের সঙ্গে কী কথা বলতে বলতে চলেছে। যতক্ষণ দেখা যায়, ওদিকে তাকিয়ে রইলাম—সুসানকে সামনের দিকে তাকাতে দেখলাম না।

ক'দিন পরেই অফিসের পথে সুসানের সঙ্গে দেখা। চোখে তার সলজ্জ হাসি। ভাবটা যেন, অনেকদিন পরে দেখা হলো। এক সঙ্গেই ট্রামে উঠলাম। পাশাপাশি দাঁড়ালাম। এক সময়ে সুসান বললে, শনিবার মেট্রোতে ম্যাটিনীর দুটো টিকেট কিনে অপেক্ষা করো। ভুলো না।

—ভুলের ব্যাপার তো তোমার।

—আচ্ছা, পরখ করবে।

—আমাকে না তোমাকে?

সুসান ততক্ষণে বই খুলে পড়তে শুরু করেছে। গুরুতর বই। ইশারউডের ভাগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

মেট্রোতে সুসানের লাজময়ী রূপ দেখে আমার সন্দেহ হলো, নিশ্চয়ই কোনো রসিক পুরুষ

পেছন পেছন আসছে। আশেপাশের সকলের বিস্ময় উদ্রেক করে সুসান ছেলেমানুষের মত আমার হাত চেপে বললে, নিশ্চয়ই তুমি এক ঘণ্টা আগেই এসে অপেক্ষা করছো?

—হ্যাঁ, প্রায়।—ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে জোরে শ্বাস টেনে বললাম।

—আগেই জানতাম। হয় লেট হবে, নয় অনেক আগে আসবে। সময়ের ঠিক তোমার নেই। ভেতরে চলো।

—আমরা দু'জনেই তা হলে যাব!

সুসান চোখ টিপে হাসলে, দু'জন কোথায়, আমরা তিনজন। আমি, তুমি আর তোমার জেলাসি। এবার চলো!

ছবি দেখতে দেখতে সুসান তন্ময় হয়ে গেল। আমার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে, হাতে হাত রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। তার উষ্ণ শ্বাস ও এসেন্সের গন্ধে পর্দার চিত্রগুলি অনর্থক আমার চোখের সামনে নেচে চলে গেল। গালের নরম চাপ আমার কাঁধ থেকে হৃদপিণ্ডে এসে পৌঁছুল।

ছবি দেখে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালাম, সুসানের চোখ দুটি ছলছল করছিল। সুক্ষ্ম বিয়োগান্ত নাটক একটি মেয়ের জীবনে—দর্শকদের ভেতর একটা থমথমে ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সে জন্যে কারোর চোখেই কৌতূহল ছিল না। আমরা নিঃসাড়ে বেরিয়ে আসতে পারলাম।

'টিংকা'য় বসে চা খেতে খেতে সুসান বললে, এর মধ্যে আমার জীবনের ছাপ খুঁজে পেলাম।

—মেয়েদের একটা সহজ সমবেদনা আছে।

—তার জন্যে সত্যকে বিকৃত করা যায় না। সাধারণ জীবনেও অসাধারণ কিছু ঘটে থাকে। তাই এ ছবির গল্প—আমার গল্পও।

—সুসান, তোমার জীবনের যতটা গল্প আমি জানি—যতটা চোখে দেখেছি, তা আমাকে খুশী করেছে।

সুসান হেসে বললে, ঐ জন্যেই তোমাকে ঘরের ঠিকানা দিই না—তুমি দুঃখিত হবে বলে।

—মেয়েরা কখনো সুখী হয় না, কারণ তোমরা হৃদয়ের জোরে চলো।

—থাক, তোমার রায় আমি মানলাম না। যে কোন লোক বলবে তোমার চেয়ে আমি কম সেন্টিমেণ্টাল।

—সুসান, তোমার অন্য রূপ আমি একদিন দেখেছি।

—তুমি নিশ্চয়ই খুশী হয়েছ?

—নিশ্চয়ই। বাচ্চাদের আমার আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

—চলো, বাইরে হাওয়ায় যাই।

গড়ের মাঠে আই-টি-এফ প্যাভিলিয়ন ছাড়িয়ে একটি গাছের তলায় আমরা এসে বসলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চারদিক আলোকমালায় সেজে আছে। দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ভ্রমণার্থীর ভিড়। একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমাদের কাছাকাছি ছুটোছুটি করছে।

সুসান যেন অনেক দূর চলে গেছে। ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললাম, কী ভাবছো সুসান!

—মণি, ছেলে দুটি আমার সন্তান নয়।

—ভদ্রলোকটি?

—ছেলেদের বাবা। আমার স্বামীও বলতে পারো। তাঁর প্রথম পরিচয় যা বললাম সেটুকুই আমাকে বেঁধে রেখেছে। কারণ, ছেলেরা আমার দিদির সন্তান। দিদির মৃত্যুশয্যায় আমি কথা দিয়েছিলাম—এদের দায়িত্ব আমি যথাসম্ভব মাথা পেতে নেব। 'মামি' টাকার কথাটাও ভাবলে, তাই বাধ্য হয়ে আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে।

—এ বিয়েতে তুমি সুখী নও?

—এটা বিয়ে নয় মণি, বন্দোবস্ত। আমার সন্তানের পিতা কবে আসবে, আমি তার অপেক্ষায় আছি। তাইতো ট্যাগোরের কথাটা আমার এত ভালো লেগেছে, মণি! বসে আছি ভরামন নিয়ে, দিতে চাই নিতে কেহ নাই! আমি যে ভরা মন নিয়ে তার অপেক্ষায় আছি।

সুসানের হাতে চাপ দিয়ে বললাম, এত লোক দেখলে কাউকে তোমার পছন্দ হলো না? এটা তোমার বাড়াবাড়ি সুসান!

—হয় তো তা-ই। হয় তো সারাজীবন আমার এ ভাবেই কেটে যাবে। শরীরে অনেক বিষ, অমৃতের সন্ধান শুধু একজনেই পায়। তোমরা পুরুষরা সেটুকু বুঝতে চাও না, তা-ই যা পাও তাতেই তুষ্ট।

—কিন্তু তোমাদের মধ্যে তো ভালোবেসেই বিয়ে হয়।

—মণি, ক'জন ভালোবাসতে পারে। অনেকটাই ভালোবাসার ভাণ।

—বুঝেছি ভাগবত গীতার অনুবাদ তোমার সর্বনাশ করছে।

সুসান জোরে হেসে উঠল। আমার গায়ে চিমটি কেটে বললে, তা হলে তোমাকে নিয়ে ঘর করা উচিত।

—আবেদন করবো কি?

—লাভ নেই। অগ্রাহ্য হবে। তোমার পিতৃত্ববোধ নেই, তুমি চাও সেবা। তুমি বড় নির্ভরশীল। সেজন্যে তুমি আমায় কিছু আকর্ষণ করছো।

—তাহলে লোক খুঁজি?

সুসান হেসে বললে, সিলি চ্যাপ, ও দায় যে আমার। যাকে দেখলে আমার শরীর মন অনুসরণ করবে, তাকেই তো আমি ডাকব।

—যদি তোমার ভুল হয়।

—ভুলের সুযোগ নেই। আমি আগেই যে মায়ের দায়িত্ব নিয়েছি। একজনকে দেহদান করছি—

ধীরে ধীরে গাঢ় রাত্রি নেমে এল। বাচ্চারা অনেকক্ষণ হলো বাড়ি ফিরে গেছে। সুসান আমাকে ঠেস দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে এক্ষুণি যেন ভোর হবে আশা করছে। এ রাত্রি অন্য কারোর জন্যে।

সমকালীন লেখকের দায়িত্ব

নারায়ণ চৌধুরী

সমসাময়িক সাহিত্য, সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই বাদ-বিসম্বাদ বিতর্ক-বিরোধের ঝঞ্ঝাবর্তের মধ্যে পড়ে যেতে হয়। এই বিবাদ-বিতর্ক পরিহার করবার উপায় নেই, কেন না মতবাদ ও আদর্শের সংঘাত থেকেই এই আপাত-অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সূচনা হয়। সমকালীন সাহিত্য শিল্প রাজনীতি ইত্যাদির ভিতর নানা মত আছে, ওই মত-সকলের ভিতর দ্বন্দ্ব-সংঘাত এক এক সময় নিতান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে। তা থেকে এমন কথা বলা চলে না ওই দ্বন্দ্ব-সংঘাত আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে চলবার পরামর্শ তাঁরাই দেন যাঁরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে path of least resistance-কে আঁকড়ে চলবার চেষ্টা করেন। এই-সব অতি শান্তিপ্রিয় নিরীহের দল পাছে অপরের অপ্রীতির কারণ হন সেইজন্য সমকালীন জীবন নিয়ে আলোচনা করতে আদপেই ভরসা পান না; তাঁরা নিরাপত্তা ও মানসিক স্বস্তির মোহে গত জীবন গত মানুষ গত কাল নিয়ে আলোচনায় সময়ক্ষেপ করতেই সমধিক স্ফূর্তি অনুভব করেন।

সমসাময়িক শিল্প সাহিত্য নিয়ে আলোচনার অনেক হাঙ্গাম। কে চটেন কে মুখভার করেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। যাঁরা ভীরু স্বভাবের লোক, এবং যে পরিমাণে ভীরু সে পরিমাণে আরাম স্বাচ্ছন্দ্য অর্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার কাঙাল, তাঁরা স্বতঃই এ জাতীয় ঝক্কি পোয়াতে চান না। তাই তাঁদের মুখে প্রায়শ সমকালীন জীবনের সমালোচনার অসারতা সম্পর্কে নানারকম গালভরা কথা শুনতে পাওয়া যায়। সত্যভাষী বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তিদের এঁদের বড় ভয়। কেন না যাঁরা সত্যসন্ধ ও নির্ভীক, তাঁরা অপ্রিয় সত্যভাষণে দ্বিধা করেন না এবং এইরূপ অকুণ্ঠ সত্যভাষণের দ্বারা তথাকথিত গোবেচারা নিরীহদের অসোয়াস্তির কারণ সৃষ্টি করেন। স্পষ্টতই এ রকম শান্তিভঙ্গকারী সত্যভাষী ব্যক্তি গড়পরতা সাধারণ মানুষের মন-পুত হতে পারেন না, হনও না। তা বলে তাঁদের প্রয়োজন ফুরোয় না। কিছু কিছু শক্তিধর মানুষ জন্মানই সমসাময়িক জীবনের নির্জীব আবহাওয়াকে প্রচণ্ড ঝাপ্টা দেবার জন্য। তীক্ষ্ণ তীব্র সমালোচনার ডাঙস মেরে আত্মসমালোচনাবিহীন অচেতন আত্মতৃপ্ত সমাজমানসকে সবেগে নাড়া দেওয়াই তাঁদের কাজ। শিল্প-সাহিত্যের পঞ্জরে পঞ্জরে সচলতার বেগ, সজীবতার আবহাওয়া সঞ্চার করবার জন্যই তাঁদের আবির্ভাব। সাহিত্যকে এঁরা আলোচনা-প্রত্যালোচনার দ্বারা, সৃষ্টিকর্মসকলের প্রকৃত মূল্যমান নির্ধারণের চেষ্টার দ্বারা নিয়ত স্পন্দমান রাখেন, আবহাওয়াকে কখনও ঝিমিয়ে পড়তে দেন না। সমসাময়িক জীবনের সত্যমুখী অপ্রিয় সমালোচনাকে 'নঞর্থক' আখ্যা দিয়ে প্রায়শ এ জাতীয় সমালোচনা যাঁরা করেন তাঁদের কোণঠাসা ও একঘরে করে রাখার

চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ভেবে দেখা দরকার, সাহিত্য-শিল্প সমাজমানস ইত্যাদিকে যাঁরা সত্যসন্ধ সমালোচনার দ্বারা নিত্য সজাগ রাখার চেষ্টে করেন তাঁদের কাজের একটা মস্ত বড় 'সদর্থক' (positive) দিকও আছে। আর কোন কারণে না হলেও এই কারণে অন্ততঃ এঁদের প্রতি সমসাময়িক সমাজের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

পাঠক সাধারণ লক্ষ্য করে থাকবেন, এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভিতর যে সকল পদভারাক্রান্ত উচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিত রয়েছেন তাঁরা সমসাময়িক শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের আলোচনায় উদাসীন। বর্তমান কালের প্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ তাঁরা যেন আরও বেশী করে তাঁদের দৃষ্টি অতীতে বিসর্পিত করে থাকেন। বারংবার ও ভূয়সী আলোচনার দ্বারা যে সকল শিল্প বা সাহিত্যকর্মের মূল্যমান মোটামুটি স্থিরীকৃত হয়ে গেছে, যাদের সম্পর্কে নতুন কথা বলবার অবকাশ বলতে গেলে আর বিশেষ-কিছু নেই, সেই সকল বিষয়ের বহুল উচ্চারিত আলোচনার উপর আর-এক দফা দাগা বুলিয়ে যাওয়াই যেন তাঁদের কাজ। যে সাহিত্য সমকালীন, আর সমকালীন বলেই যে সাহিত্যের উপভোগ্যতা সম্পর্কে পাঠকসমাজে মিশ্র অনুভূতি ও মতভেদ বর্তমান, সে সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিষয়ে রায়দানের অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে যিনি তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ও মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। আমাদের ডক্টরেট-উপাধিধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ গবেষকদের মধ্যে সচরাচর এই মৌলিক শক্তি থাকে না বলেই তাঁরা প্রায় সবাই ব্যতিক্রমবিরহিত ভাবে পুরাতনের অনুরাগী। যে মাল বস্তাপচা বাসী বহু বছরের ঘুণ-ধরা পরিত্যক্ত সরঞ্জামের সামিল, তারই 'পরে যেন এই সব উপাধিক প্রৌঢ় পণ্ডিতদের সমধিক পক্ষপাত। একালের পরিধিতে বাস করে পুরাতন চেতনায় ডগমন হওয়ার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে হলে মুখ্যতঃ এঁদের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করতে হয়।

শুধু যে যুগপ্রভাবের প্রতি ঔদাসীন্য বা পুরাতন-প্রীতি এই মনোভাবের পশ্চাতে সক্রিয় রয়েছে তা-ই নয়, এর পশ্চাতে আরাম-আয়েস প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি হারাবার ভয়ও কম লুক্কায়িত নেই। পূর্বেই বলেছি, সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ঝামেলা অনেক। সকলে এই ঝামেলা পোয়াতে চান না। বিশেষ, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁদের একচক্ষু বুদ্ধিচর্চায় নিবদ্ধ আর এক চক্ষু বিষয়-আশয় ধনসম্পত্তি সামাজিক মানমর্যাদা লাভের লোভের উপর নিবদ্ধ তাঁরা এ জাতীয় ঝামেলা থেকে শতহস্ত দূরে থাকেন। তাঁদের অতীত-প্রীতির সঙ্গে নিরাপত্তা-প্রীতিও বড় কম জড়ানো নেই। সমকালীন শিল্প সাহিত্য সমাজ বা রাজনীতির বিষয়ে কথা বলতে গেলে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমনের উপর তার সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়ার দায়িত্বটুকুও ঘাড় পেতে নিতে হয়। সমকালীন সমালোচনায় কেউ খুশি হন কেউ রুষ্ট হন। তুষ্টের চাইতে রুষ্টের সংখ্যাই সাধারণতঃ বেশী হয়। তার কারণ সত্যনিষ্ঠ সমালোচক কারও মন রেখে কথা বলেন না, স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধিমতে যা সত্য বলে মনে করেন তা অকুণ্ঠিত ভাবে প্রচার করেন। স্বভাবতঃই এ জাতীয় নির্ভীক সমালোচনায় বহু লোক কুপিত হয়। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষীয়েরা ক্ষেত্র বিশেষে সমালোচকের নানারকম ক্ষতি করারও চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু সমকালীন সমালোচক তাতে

বিচলিত হননা, তিনি এ সমস্ত প্রতিকূল—কখনও-সখনও বিপজ্জনক—সম্ভাবনা মেনে নিয়েই তাঁর দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন। স্বতঃই এ জাতীয় মনোবল আরামলোভীদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। মানুষকে ঘাঁটাবার আশঙ্কায় তাঁদের ভয়ভীত মন আত্যন্তিক নৈশ্চিন্ত্য-নিরাপত্তার মোহে সাহিত্যকর্মের এমন একটি ক্ষেত্র বেছে নেয় যেখানে মানুষকে চটাবার বা ঘাঁটাবার ভয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যারা মরে ভূত হয়ে গেছে তাদের নিন্দাই হোক আর প্রশংসাই হোক, তাতে কোন প্রকার প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। অতীত বলেই মানুষের মনে তা কোনপ্রকার তীব্রগভীর অনুভূতির সঞ্চার করে না। আর ওই খানেই হচ্ছে এঁদের সব চাইতে বড় জোর। অতীতে বাস করা চিন্তার শ্রম লাঘবকারীও বটে আবার নিরাপদও বটে।

চিন্তার শ্রম লাঘবকারী এই কারণে যে, যে সকল বিষয়ের ভালমন্দ অল্পবিস্তর স্থিরীকৃত হয়ে গেছে সে বিষয়ে রায় দেওয়া সহজ, মৌলিকতার দায় সে ক্ষেত্রে বড়-একটা পোয়াতে হয় না। কিন্তু সমকালীন বিষয় সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। এখানে প্রতি পদে স্বকীয় বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়, সতর্ক অভিনিবেশের সহিত অগ্রসর হতে হয়। পুরাতন কথার পুনরুক্তি করা এক, আর সম্পূর্ণ নূতন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আর। স্পষ্টতঃই শেষোক্ত ক্ষেত্রে মৌলিকতার প্রয়োজন পদে পদে এবং অলঙ্ঘনীয়। সমসাময়িক সমাজ বা সাহিত্য বা রাজনীতির সমালোচকদের এই জন্য দায়িত্ব এত বেশী। তাঁদের দায়িত্ব বিপদশঙ্কামুক্ত নয় বলেই আরও বেশী গুরুতর।

প্রশ্নটিকে আরও একটু তলিয়ে বিচার করা যেতে পারে। সমসাময়িক জীবনের বিভিন্ন দিকের ত্রুটিবিচ্যুতি অসম্পূর্ণতা দুর্বলতা ইত্যাদির সমালোচনা করবার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি ওই সমাজের মধ্যেই দেখা না দেন, সে সমাজের বিপথগামী হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা কেউ রোধ করতে পারে না। রাজনীতিতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পক্ষকে সংযত রাখার জন্য যেমন বিরোধী দলের (Opposition) প্রয়োজন হয়, তেমনি সমাজজীবনের অন্যান্য নানা বিভাগেও একই রকমের প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। সবাই যার যা খুশী করে যাচ্ছে লিখে যাচ্ছে অথচ তার আলোচনা-প্রত্যালোচনা হচ্ছে না, আলোচনা যদি বা হয় শতকরা নিরনব্বুইটি ক্ষেত্রে তা স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত নির্জলা প্রশংসার রূপ নিচ্ছে—এ রকম অবস্থা কোন দেশ বা সমাজের পক্ষে আদৌ সুস্থ অবস্থা নয়। যদি বলেন নির্জলা প্রশংসার মত নিরবচ্ছিন্ন নিন্দাও তো সমান অগ্রাহ্য সেই ক্ষেত্রে বলব, আমরা, অভিপ্রায়প্রণোদিত নিন্দা বা প্রশংসা কোনটিরই পক্ষপাতী নই, আমরা চাই সঠিক বিচার, যুক্তিনিষ্ঠ বিচার। সমকালীন বুদ্ধিজীবি সমাজের মধ্যে যাঁদের সহজাত বিচারপ্রবণতার তথা সৎসাহস ও দৃঢ়তার খ্যাতি আছে, তাঁদের হাতে প্রতিটি বিশিষ্ট আন্দোলন ও শিল্পকর্মের নিরপেক্ষ বিচার আমরা প্রত্যাশা করি। কাউকে বন্ধুবৎসলতার ঠেকোর সাহায্যে প্রশংসার সপ্তম স্বর্গে চড়ানো বা ব্যক্তিগত অসূয়ার বশে নিন্দা-পরিবাদের অতল সমুদ্রে নিক্ষেপের প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে আদৌ ওঠে না। যুক্তিনিষ্ঠ বিচার-ক্রিয়ার মধ্যে স্বার্থশূন্য প্রশংসা বা নিন্দা কোনটিরই স্থান নেই।

যে কোন রকমের ঝঞ্ঝাটের নামে এক শ্রেণীর মানুষের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে।

সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের ভিতর এ জাতীয় মানুষের অসদ্ভাব নেই, বরং সাহিত্যেই এমনধারা শান্তিপ্রিয় নিরীহ গোবেচারা মানুষ বেশী খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে একটি লৌকিক ধারণা এই যে, ওটি মূলতঃ লালিত্য সৌকুমার্য মাধুর্য ও সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্র, বজ্রদৃঢ় চারিত্র অনুশীলনের ক্ষেত্র ওটি নয়। বীর্যবত্তার সংস্কারের সঙ্গে নাকি সাহিত্যের আবশ্যিক কোন যোগ নেই। এই ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক মেরুদণ্ডহীন নম্র-কোমল জীব এসে সাহিত্যের এলাকায় ভিড় জমায় এবং তথাকথিত সৌন্দর্যসৃষ্টির অজুহাতে নিরবচ্ছিন্ন কোমলতা ও লালিত্যের চর্চা করে সাহিত্যসেবার আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। মৌলিক সৃষ্টির আনন্দে এঁরা অনুক্ষণ নিমগ্ন, তাই চারিত্র অনুশীলনের অবসর প্রায় পান না। এঁরা সৃজনধর্মী আর্টের চর্চায় যে পরিমাণ কুশলী তাঁর চাইতে অনেক-অনেক গুণ কুশলী সকলকে খুশি রাখার কঠিনতর আর্টে। পাছে কেউ অসন্তুষ্ট হয় এবং পাছে কেউ তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের প্রতিকূল সমালোচনা করে সেই জন্য এঁরা সকলেরই মন জুগিয়ে চলতে চেষ্টা করেন। এঁরা যেহেতু তথাকথিত সৃজনমূলক সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত সেইহেতু এঁদের আর কোনরূপ দায়-দায়িত্ব যেন থাকতে নেই।

আসলে কল্পিত সৌন্দর্যচর্চার সযত্নরচিত বিবরে এই যে অনুক্ষণ আত্মগোপনের প্রয়াস, এক হিসাবে দেখতে গেলে এ জিনিষ স্বসমাজ ও সমসাময়িক যুগের প্রতি দায়িত্ব এড়ানোর প্রয়াসের নামান্তর। এঁরা সৌন্দর্যের দাবী মানেন অথচ নীতির দাবী মানেন না—এ এক কিম্ভূত অবস্থা। বিশুদ্ধ নন্দনবাদীদের মত দায়িত্ব-অচেতন সমাজ-অচেতন সম্প্রদায় আর কল্পনা করা যায় না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে নন্দনবাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সমাজ-কল্যাণভাবনা অনুপ্রবিষ্ট। সেই কারণে ও দেশে সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের পাশে পাশে সাহিত্য তথা সমাজ-সমালোচনামূলক সাহিত্যও সমান পুষ্ট হয়ে চলেছে। ও-দেশে যেমন বড় বড় কবি ঔপন্যাসিক নাট্যকার আছেন তেমনি আবার দুর্ধর্ষ সমালোচকও আছেন। একজন রুশো কিংবা ভলটেয়ারের মর্যাদা একজন প্রথম শ্রেণীর কবির মর্যাদা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। আবার সৃষ্টি ও সমালোচনা-তৎপরতার ধারা এক খাতে এসে মিশেছে এমন ব্যক্তিত্বেরও অভাব নেই। যেমন ইংরেজী সাহিত্যে মিলটন, সুইফ্‌ট্, ডিফো, ম্যাথু আর্নল্ড, বর্ণার্ড-শ, এলিয়ট; ফরাসী সাহিত্যে ভলটেয়ার, হুগো, জোলা, আনাতোল ফ্রাঁস, জাঁ পল সার্ত্র্ প্রভৃতি। সব্যসাচীর ন্যায় সৃষ্টিমূলক সাহিত্য ও সমাজ-সমালোচনা-মূলক সাহিত্য—রচনাতৎপরতার এই দুই ধারাতেই এঁরা সমান কৃতী। সৌন্দর্যের দাবীর পাশে পাশে এঁরা সত্য ও শিবের দাবীর সম্পর্কেও সমান সচেতন।

কিন্তু এদেশের লেখকরা সব সৃষ্টিকর্মে বুঁদ হয়ে আছেন, আর কোনদিকে তাকাবার তাঁরা অবকাশ পান না। শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে এর চাইতে আত্মবঞ্চনাকর মনোভাব বোধ হয় আর কিছু হতে পারে না।

পুরশ্চরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যের আগমন-বার্তা মুখুয্যেবাড়ীতে ঘোষিত হল শান্তির শঙ্খধ্বনিত। ঠাকুর ঘরে সান্ধ্য-প্রদীপও জ্বালল শান্তি আর বুড়ো হাড়ে নিত্যি যা ভুবনমোহিনী দিয়ে থাকেন, সেই মঙ্গল ছড়াও প্রতিটি ঘরের চৌকাটে মায় বাইরের সদর দরজা পর্যন্ত শান্তি দিয়ে এল। তারপর ঠাকুর ঘরে ফিরে গঙ্গাজলের ঘটিটা নামিয়ে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে গলায় আঁচল দিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসে প্রণাম করল আর অস্ফুট স্বরে বললে,—সকলের মঙ্গল কর ঠাকুর।

—মা কোথায় গো, মা। সাড়াশব্দ নেই আজ ব্যাপার কি? সিঁড়িতে জুতোর শব্দ থেমে গেল, তারপর আবার ওঠার শব্দ। বিপিন বাড়ী ফিরেছে। জামা-কাপড় ছাড়তে ওপরে উঠল।

—শান্তিমাই নাকি? কি খবর? বিপিন হেসে জিজ্ঞেস করলে শান্তি ঠাকুর ঘর থেকে বের হতে।

—ঠাক্‌মার জ্বর হয়েছে। কাকীমাও নেই, হঠাৎ কেষ্টনগর চলে গেছে, সেখানে দিদিমার অসুখ।

—তাই নাকি? মনটাও এরকম একটা আঁচ করছিল, তা নইলে—। বিপিন মাঝপথে থামল।

—তা নইলে কি কাকামণি?

—কিছু নয়। অফিসে একটা ব্যাপারে মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল যে—

—চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে চলে এলে, তাই নয়?

—তুই কি করে বুঝলি বলত মা-মণি? সত্যিই তাই। চাকরী করি বলে মনে করে কিনা মনুষ্যত্বটাও বিক্রি করেছি। ও আমার সহ্য হল না। আর ও পথে নয়। গামছা ফেরী করব তবু আর চাকরী নয়। চাকরী করে এমনি মন-প্রাণ সব বিক্রি করতে আমি পারব না।

—তা বেশ ত, এখন যাও দেখি জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে নাও। আমি তোমার চা করছি।

—এই যে যাই।—এই বলে বিপিন নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। আজকের অফিসের ঘটনা থেকে মনটা কিছুতে সরাতে পারছে না বিপিন।

খুব সামান্য একটা ঘটনা। অফিসের এক্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু বিপিন। ওপরওলা বেল সায়েব একটু বদরাগী আর মেজাজী, খুশি হল তো দশটাকা মাইনে বাড়ল কেরাণীর, আর রাগ হল তো গেট আউট ইউ রাসকেল।

দরকারী একটা চিঠি—কোটেশনের। জবাব দেওয়া হয়নি। আর চিঠিটাও প্রথমে ঠিক পাওয়া যায়নি। সায়েবের টেবিলেই পড়েছিল। দোষটা কারো নয়। সম্পূর্ণ একটা ভুলের ব্যাপার। কিন্তু সেটুকু বোঝার আগেই বেল সায়েব বিপিনকে ডেকে চোখ রাঙাল—ওয়র্থলেশ! অল অফ্ ইউ বেঙ্গলি বিষ্টস্—আই নো ওয়েল।

শুনে প্রথমটা বিপিন একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর সেও চোখ পাকিয়ে বললে—মিষ্টার বেল, প্লিজ হোল্ড ইওর টাঙ্গ, অর্ আই স্যাল্ টিচ্ ইউ এ গুড লেসন্।

—হাউ ডেয়ার সে সো, ইউ সোয়াইন।—বেল সায়েব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

এরপর বিপিন হঠাৎ ধৈর্য হারাল। বৈষ্ণমী নম্রতার শিক্ষা ওকে সংযত করতে পারল না। বিপিনও রুখে গেল। একটা বেশ ভারী চড় মারল সায়েবের গালে।

—বেয়ারা, বেয়ারা, নিকাল দো বদমাসকো। বেল সায়েব রীতিমত ভয় পেয়েছে।

আরো দুটো চড় মেরে বেলকে ছেড়ে দিলে বিপিন। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—গো এ্যাণ্ড টেক্ ইয়োর সীট। এই বলে বিপিন হাফডোরটা খুলে বেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সারা ডিপার্টমেন্টের লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল হাফডোরটার সামনে। বেয়ারাটা পর্যন্ত। এমন একটা ব্যাপার হঠাৎ ঘটে গেল যা কেউ কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি। তাই সবাই থমকে দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল।

বিপিন বেরিয়ে আসতে যে যার সীটে গিয়ে বসল। কোন কথা নেই। বিপিনও নিজের সীটে গিয়ে একটা লম্বা কাগজে কি যেন লিখে চলল।

এদিকে বেলও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বোধহয় বড় সায়েবের ঘরে।

প্রায় মিনিট পনের সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। কোন শব্দ নেই! সবায়ের লক্ষ্য বিপিনের দিকে। বিপিন লেখা কাগজটা ভাঁজ করে বেয়ারাকে ডাকল—এটা বড় সায়েবের ঘরে দিয়ে এস।

বেয়ারা ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

তারপর তার সহকারী হরিহরের দিকে ফিরে হেসে বললে—শেষ করে দিলুম হে হরিহর। আর নয়, খুব হয়েছে, চাকরী করতে এসে মনুষ্যত্ব বিকোতে পারব না।

এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিপিন।

—কোথায় চললেন? বড় সায়েবের কাছে নাকি?

—না হে আর ও মুখো নয়, সোজা রাস্তায়। মন যখন ভেঙেছে তখন আর জোড়াতালি নয়। চলি, বিকেলে বাড়ীতে দেখা হবে।

গোপীনাথ কোথায় যেন গিয়েছিল অফিসের কাজে। অফিসে এসে ব্যাপারটা শুনে সেও চটে উঠল। সোজা বিপিনের কাছে গিয়ে বেশ উচ্চ কণ্ঠে বললে—বেশ করেছেন বিপিন কাকা। ব্যাটা দিন দিন বড্ড বেড়ে উঠছিল। আরো উত্তম মধ্যম দিলে ভাল হয়।

—গোপীনাথ, হৈ হৈ কর না। যাও কাজ করগে।

—কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হতে দেওয়া কি ঠিক হবে বলুন? চলুন না সবাই মিলে বড় সায়েবের ঘরে।

—না থাক, আমি যখন আর এখানে চাকরী করব না, তখন আর হৈ চৈ করে কি হবে। তোমরা কাজ কর, আমি চলি।

কোট গায়ে দিয়ে বিপিন যাবার উদ্যোগ করে।

—চাকরী ছাড়া কি—। গোপীনাথ বাকী কথা শেষ করতে পারে না। কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে।

—ঠিক কি বেঠিক জানিনা, তবে মন আর চাইছে না। হেসে বললে বিপিন, তারপর আস্তে আস্তে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। সহকর্মীরা উঠে দাঁড়িয়ে নীরব শ্রদ্ধা জানাল। কেউ আর কিছু বললে না।

বিপিন রাস্তায় নামল। অনেকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক ঘুরল। ইডেন গার্ডেনে গিয়ে গাছের তলায় কাটাল। নিয়মের ব্যতিক্রম। দীর্ঘ পনের বছরের মধ্যে এই প্রথম ব্যতিক্রম।

অনেকক্ষণ কেটে গেল কাজটা ভাল হল কিনা তাই বিচার করতে। গাছতলায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে জাবর কাটল. কি উচিত কি অনুচিত, তাই নিয়ে। শেষে এক সময় জড়তা কাটিয়ে উঠে দাঁড়াল। যা হয়েছে ভালর জন্যেই। পাল কোম্পানীর ছোটবাবু এই সেদিনই তো অফিসে বললে—কি করছেন মুখুজ্জে মশাই কলম পিষে, কটা টাকাই বা পান? নেমে পড়ুন না আমাদের লাইনে। সময়টাও আসছে, মস্ত সুযোগ, হেলায় হারাবেন না। আপনারা বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি বুঝতেই পারছেন।

কথাটা তখন আমলই দেয়নি বিপিন। কিন্তু এখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। না, পাল কোম্পানীতে একবার যাওয়াই যাক।

তারপর প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত পাল কোম্পানীতে। ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা।

—লাইনটা লোহা লক্করের। কিন্তু আখের আছে। যদি ঘৃণা না করেন তো লেগে পড়ুন। বিড়ি টানতে টানতে ছোট পাল বললে।

—ঘৃণা কেন হবে? কাজকে কি ঘৃণা করতে আছে? ছোটই হোক আর বড়ই হোক, মনটা ঠিক লাগাতে পারলে সব কাজই ভাল ফল দেবে, এত স্বামিজীর মত জ্ঞানী মহাপুরুষেও বলেছেন।

—তাই নাকি, স্বামীজী বলেছেন তো! কিন্তু লেখাপড়া জানা বাঙালী জাতটা এমনই যে এই মহাপুরুষের কথাবার্ত্তা শুনেও বাবুটি সেজে পান চিবুতে চিবুতে অফিসে গিয়ে বড় সায়েবের জুতো পালিশ করতেই ভালবাসে সেই জন্যই বাঙালীদের অধঃপতন। দেখুন দেখি মাড়োয়াড়ীদের দিকে একবার।

—তা বটে। তা কি করি বলুন দেখি পাল মশাই?

—লেগে যান যা বলছি। আর পাশের ঐ ছোট ঘরটা খালি আছে, ভাড়া বেশী নয়। ওটা নিয়ে নিন আজই। আমিই এখন টাকাটা দিচ্ছি এ্যাডভান্স বাবদ। সেলামীও লাগবে না—কত সুবিধে!

—তাই দিন, ব্যবসাই সুরু করা যাক।—সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে বিপিন।

—এই তো চাই। বেশ ভালই হল, বিজ্ঞান লোককে আমিও পাশে পেলুম, আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। নিন তাহলে উঠুন দেখি ঘরটার ব্যবস্থা করে আসি।

—তাই চলুন।—বিপিন উঠে দাঁড়াল নতুন এক জগতে প্রবেশ করার প্রাথমিক ব্যবস্থার তোড়জোড় করতে। (ক্রমশঃ)

আলোচনা

দেহ ও দেহাতীত

জীবনকে ঝঙ্কৃত ও রঞ্জিত করে তোলার যে কটি শোভন উপচার—নাচ গান ও অভিনয়, চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য, নাটক গল্প ও কবিতা—এ সবেরই মূল প্রেরণা হল মুক্ত জীবনানন্দ। মানুষ প্রকৃতির কোলে সহজভাবে বেঁচে যে আনন্দ পেত, তাকে নানা মাধ্যমে রূপায়িত করে সে আনন্দ ফিরে পাওয়ার কামনা প্রকাশ করে মানুষ শিল্পসৃষ্টির ভিতর দিয়ে। সব শিল্পসৃষ্টিরই বিষয়বস্তু ঐ একটি মাত্র এমন কথা বলছিনা, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল সুর যে তাই সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

মানুষ যে প্রকৃতির কোলে সহজ জীবন যাত্রায় আর ফিরে যেতে পারবে না, এই সত্যটুকু আজ মেনে না নিয়ে উপায় নেই। শিল্পীর কল্পনা যতই উধাও হয়ে ছুটুক, মানুষের জীবন আজ নগরপ্রধান সভ্যতার ইঁটেকাঠক্রিটে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে গেছে। তাই শিল্পের মাধ্যমে মুক্ত-জীবনানন্দের সাধনা হা-হুতাশেই পর্যবসিত।

মনকে যেখানে খুসী চালিয়ে দেওয়া যায়, তাতে পলাতকা প্রবৃত্তি কিছুটা তৃপ্তও হয়, কিন্তু কাজের কাজ হয় কতটা! অথচ যে সহজ জীবনকে ঘিরে আজ কবিশিল্পীদের কামনা ঘুরপাক খাচ্ছে, তার উপচার মন ততটা নয় যতটা কিনা এই দেহ। সভ্যতার বন্ধনে দেহ বাঁধা পড়বার পরেই তো মনের মুক্তি-আন্দোলন সুরু হয়েছিল; দেহ যতদিন স্বাধীন ছিল মন বা মগজ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায়নি কেউ।

মনের আর মগজের অনুশীলন করতে করতে দেহাতীতের সন্ধানে দেহকে ভুলতে বসেছিল মানুষ। পেগানধর্মী গ্রীকরা দেহকে ভালবেসেছিল, দেহের আনন্দকে স্বীকার করে নিয়েছিল, ছুটোছুটি ও লাফালাফির মধ্যে রক্তে যে চঞ্চলতা ও চমক জাগে শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় তাকে উললব্ধি করেছিল; সুন্দরের ধ্যানকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিল রক্তমাংসের দেহকে দেবোপম সৌন্দর্যে মণ্ডিত করার সাধনায়।

রোম যখন গ্রীসের ভাবধারা গ্রহণ করলে, গ্রীক দেহচর্চার শিল্পী ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী তারা পেল না। দেহসঞ্চালন করলো বটে, কিন্তু তার মধ্যে তাদের রক্তপিপাসিত জিঘাংসাই লোলুপ হয়ে উঠ্‌লো, দেহের মধ্যে চিরসুন্দরের প্রতীক ওদের চোখে পড়লো না, দেহকে জ্ঞান করলে নিছক স্থূল ভোগের উপকরণ। জিঘাংসা ও ভোগপৃহাকে সার্থক করবার জন্য ব্যগ্র রোমান সমাজজীবন এমন স্তরে নেমে গেল যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল রোমান জগতের সর্বত্র। যীশুখৃষ্ট ইন্দ্রিয় নিরোধ সম্পর্কে যৎসামান্য ইঙ্গিত করেছিলেন মাত্র। কিন্তু সেই ইঙ্গিতকে ভাষ্য ও ব্যাখ্যায় পল্লবিত করে মধ্যযুগের খৃষ্টানরা দেহকে জীবনানন্দের উপকরণ তালিকা থেকে বাতিল করে দিলে। দেহনিগ্রহই হল ধার্মিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

রেণেসাঁসের যুগে গ্রীক সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ হল বটে, কিন্তু দেহ রয়ে গেল শিল্পের বিষয়-বস্তু হয়ে, প্রাণ নিয়ে সজীব হয়ে উঠ্‌লো না। যুদ্ধবিগ্রহ বাণিজ্য দিগ্বিজয়—এ সবের মদে মাতাল হল একদল, আর একদলের চোখে জ্ঞান ও শিল্পের প্রদীপ্ত আলো সব কিছু সাদা করে দিল। মানব দেহ যে সুন্দরের মূর্তবিগ্রহ হতে পারে, ছুটে লাফিয়ে যে অনবদ্য আনন্দে মন মশগুল হতে পারে, অসীমের পানে উধাও হওয়ার একমাত্র সম্ভাব্য রূপ যে দেহকে ছুটতে দেওয়া—এ চিন্তা ঠাঁই পেল না রেঁণেসাঁস সংস্কৃতির কোথাও।

সেই রেঁণেসাঁস সংস্কৃতি ইংরেজ জাতির স্বভাব গাম্ভীর্যে মণ্ডিত হয়ে এলো ভারতে। মধ্য যুগের দেহনিগ্রহনির্ভর খৃষ্টধর্মের স্থান নিয়েছিল দেহ-উদাসীন ধর্ম। সেই ধর্মের প্রচারক পাদ্রীর দলই ভারতে পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার করলে।

আমরা "ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা" ও ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবাদে পুষ্ট জাতি। হরধনুভঙ্গ মল্লযুদ্ধ বা লক্ষ্যভেদ—দেহচর্চার ছিটে ফোঁটা যেখানে যাই পাওয়া যাক না কেন, তা ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধবিদ্যানুশীলনের অংশমাত্র। বাস্তবে গ্রীক দেহবাদের মত কোন নীতি তত্ত্ব বা ব্যবহার ভারতীয় সাহিত্য, পুরাণ, শিল্প বা কিংবদন্তী—কোন কিছুতেই কোনদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরং দেহকে ইন্দ্রিয় বলে গৌণ আসন দিয়েছি আমরা, তার অনুশীলনকে অবজ্ঞা করেছি, তার সৌন্দর্যসত্তা ও আনন্দসত্তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছি, দেহনিগ্রহকে মোক্ষ ও সাধনাসিদ্ধির মুখ্য উপায় বলে জ্ঞান করেছি।

এ হেন ভারতীয় জীবনদর্শনের উপর পড়েছে বাদশাহী আলস্য সংস্কৃতির পুরু পলেস্তারা। তার উপর পাদ্রীরা এসে চড়ালো খৃষ্টান নীতিবাদের রং। ফলে দেহ যে শুধু চাপা পড়ে গেল তাই নয়, আলোবাতাস বঞ্চিত হয়ে মরে গেল তার রস, প্রাণশক্তিও গেল ফুরিয়ে। ঘি, দুধ, ফলমূল, মাছ-মাংস পুষ্টির উপর যতটা নির্ভর ততটাই শুধু বেঁচে রইল। ধোপা নাপিত চাষা জোলা মাঝি ডোমের-ই মত দেহানুশীলনকারীরাও ব্রাত্য হয়ে উঠলো সমাজে।

বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষা সর্বপ্রথম গ্রহণ করলে বাঙালী, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির অনেক কিছু রপ্ত করলে। ন্যায়শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তিতে আমাদের মগজের অভিমান যতটুকু ছিল, ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি অর্জন করে তা দশগুণ বেড়ে গেল। মগজের আভিজাত্যে দেহকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলাম, দেহসচেতনদের প্রতি ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করলাম। শিক্ষকরা বললেন—ভালো ছেলেরা খালি পড়ে আর লেখে; পাঠ্যপুস্তকে লেখা হল সুশীল সুবোধ বালক অকারণ ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় না। ইংরেজ গম্ভীর জাত হলেও তাদের পাব্লিক স্কুলে খেলাধূলার প্রসার দেখে এসেই ফরাসী ব্যারণ কুবার্তিন অনুপ্রাণিত হলেন, প্রাচীন গ্রীকের দেহসঞ্চালন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করলেন।

সেই ইংরেজী পাব্লিক স্কুলের ছাত্ররা এদেশে এসে থাকতে লাগল রাজ্যশাসন বা বাণিজ্যপ্রসারের কাজে। কিছুটা পাব্লিক স্কুলের অর্জিত অভ্যাসে, কিছুটা সাম্রাজ্যবাদী জাতির আনন্দ মদকে রূপ দেবার প্রয়াসে, কিছুটা বা যুদ্ধপ্রয়াসী জাতির দৈহিক শক্তি অটুট রাখার

আগ্রহে এদেশের ইংরেজবাসিন্দারা নিজেদের মধ্যে খেলাধূলা সুরু করলে। তাদের দেখাদেখি খেলাধূলা ছড়ালো ফিরিঙ্গী সমাজে। আর ভারতীয়দের মধ্যে কেউ কেউ রাজভক্তিপ্রসূত অনুকরণ স্পৃহায় বিদেশী খেলাধূলা নিজেদের মধ্যে প্রবর্তন করলে, অনেকে তার মধ্যে স্বাস্থ্যচর্চার সুযোগ দেখেও তা গ্রহণ করলে।

সাম্রাজ্যশাসক ইংরেজ বুঝলে অধ্যাত্মবাদ যখন ভারতীয় জীবনে গৌণ হয়ে এসেছে, তখন যুবসমাজ বাস্তব অধিকার আদায়ের প্রয়াসেই তাদের শক্তি নিযুক্ত করবে। তাই সেই শক্তিকে বিকল্প প্রকাশ দেবার উদ্দেশ্যে তারাও সচেষ্টভাবে ভারতীয়দের মধ্যে খেলাধূলার প্রসার করলে, স্কুল কলেজ—সব কিছুর ভিতর দিয়ে।

যে কোন ভাবেই হোক হাজার হাজার বছরের নিগ্রহ মুক্ত হয়ে আমাদের যুবসমাজ যেদিন দেহসঞ্চালনের স্বাভাবিক জৈব আনন্দের স্বাদ পেল একবার, সে রসে অভিসিক্ত হয়ে গেল। সুযোগ সুবিধার যথেষ্ট অভাব সত্ত্বেও খেলাধূলা, ব্যায়াম প্রভৃতির প্রসার হতে লাগলো।

কিন্তু প্রথম যুগে খেলাধূলা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ পেল। ফলে আনন্দের চেয়ে উত্তেজনা পেল প্রাধান্য, খেলায় অংশ গ্রহণের চেয়ে দর্শক ও শ্রোতা হবার আগ্রহ দেখা গেল বেশী ও খেলাধূলা প্রসারের চেয়ে প্রচার হলো অনেক বেশী জোরালো।

ফলে পূর্ব্ব ইউরোপের সোকোল আন্দোলন, ওলিম্পিক গেমস-এর স্ফীতি, ও এদেশে মুষ্টিমেয় আগ্রহশীলের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে বর্ত্তমান জীবন যাত্রায় খেলাধূলার বিশেষ স্থান সম্বন্ধে আমরা অবহিত হলাম। ক্রমে দেশ স্বাধীন হল, নবজাগ্রত বহু ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রে খেলাধূলা ও দেহচর্চার ব্যাপক ব্যবস্থার খবর এসে পৌঁছলো আমাদের ঘরে। বিশেষজ্ঞের দল বুঝিয়ে দিলেন আমাদের যুবসমাজে প্রাণশক্তিকে প্রকাশের সহজ সুযোগ না দিলে সে শক্তি ডাকিনী যোগিনীর মত তাতা থৈথৈ নৃত্যে সমাজ জীবন বিপর্যস্ত করবে। দেশ বিদেশ থেকে শুভেচ্ছার বাণী বহন করে এল বহু খেলোয়াড়, আমাদের খেলোয়াড়দেরও ডেকে নিয়ে গেল।

এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে খেলাধূলা ও শরীরচর্চার ব্যাপক প্রয়োজন নীতি ও তত্ত্ব হিসেবে আজ স্বীকৃত হয়েছে এদেশে। কিন্তু যুব সমাজকে সুশীল সুবোধ বালক ছাড়া আর কোন রূপে দেখতে চাননা, এমন জ্যাঠামশায়ের দল আজও সমাজের শীর্ষে। অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ইটনহ্যারো সংস্কৃতির পাক করে আজ যে নতুন ভারতীয়তা জাহির করা হচ্ছে সেখানে অক্সফোর্ডের মগজী আভিজাত্য-ই উচ্চ আসন পাচ্ছে, অক্সফোর্ডের খেলাধূলার ঐতিহ্য যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছে না সমাজ ও রাষ্ট্রের ধুরন্ধরদের কাছে। আধুনিক যুগের ফ্যাশানে দোরস্ত না হওয়ার বদনাম এড়াতে লোক দেখানো পোষকতা করছেন অনেকে, ভালোবেসে এগিয়ে আসছেন না। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খেলাধূলা ও শরীরচর্চার ব্যাপক ব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করেও তার উপায় নির্দ্ধারণ করা হয়নি, এখনও মন ও মগজকেই রসের একমাত্র রসদ বিবেচনা করতে অভ্যস্ত আমাদের শিল্পী, শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতমন্য সমাজ। খেলাধূলাকে তাঁরা সংস্কৃতি থেকে পৃথক বস্তু বলেই ঘোষণা করেন। সরকারী ক্রীড়াপ্রসার পরিকল্পনা যেটুকু কার্যকরী হয়েছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, কিংবা খেলাধূলার অর্থকরী ব্যবস্থা সুসংযত করা।

আজকের দিনে একথা সব দেশের বিশেষজ্ঞই স্বীকার করেছেন যে সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম রসানুভূতি সূক্ষ্মতর হতে হতে একেবারে মিলিয়ে যাবে, যদি না দেহের ক্রমবর্ধমান সূক্ষ্মতা বোধ করা যায়। একথা আজ বৈজ্ঞানিক সত্য যে দেহমন ও মগজের সমপরিমাণ বিকাশ ও বিলাস ব্যবস্থাই সমাজ জীবনকে সুস্থ সবল সমৃদ্ধ ও আনন্দময় করতে পারে, ব্যক্তিজীবনকে মধুর ও রসঘন করে তুলতে পারে। অন্ন বস্ত্র শিক্ষা আবাসে যেমন প্রতিটি নাগরিকের অধিকার, খেলাধূলাও দেহচর্চার আনন্দে তেমনি অধিকার। যে সব রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার করে নিয়ে তার ব্যবস্থা করেছে তাদের সুখ সমৃদ্ধি হু হু করে বাড়ছে। আমাদের মোহমুদ্গরী দৃষ্টিভঙ্গী বিদূরিত করে আমরা আজ প্রাণ খুলে বলতে চাই—দেহ মগজ মন, রসের তিন উপকরণ।

রাখাল ভট্টাচার্য

বৈকুণ্ঠের উইল নাট্যানুষ্ঠান

বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চগুলির নতুনভাবে দ্বারোদ্ঘাটনে অনেকের মনেই আশা জেগেছিল, এবার বোধহয় উন্নত পর্যায়ের নাট্যবস্তু পরিবেশিত হবে। কিন্তু সে আশা সফল হল না। কারণ পেশাচার রঙ্গমঞ্চের মালিকরা তাঁদের পূর্বতন অভ্যাস বদলাতে পারেননি। নতুন নাটকের অভিনয়ে অগ্রসর হলেও তাঁরা নাট্যগুণ-বিবর্জিত অবাস্তব সস্তা নাটকই বেছে নিয়েছেন। তার ফলে আর যাই হক আর্থিক অনৈশ্চিত্যের পথে তাঁদের পা বাড়াতে হয় না; বাংলা দেশের অপরিণত দর্শক সাধারণকে ঠকিয়ে এক একটা নাটক অনায়াসে দু-তিন বছর চালান যায়। নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা? সে সব ত অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীগুলির কাজ! তার ফলশ্রুতিটুকু শুধু তাঁরা দরকার মত ব্যবহার করবেন।

গত কয়েক বছরে বাংলা দেশে নাটকের ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারই ঘটেছে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীগুলি তাঁদের অভিনয়-অনুষ্ঠান যদি চালিয়ে না যেতেন, তবে হয়ত বাংলা দেশ থেকে নাট্যাভিনয়ই উঠে যেত। অথচ নানা অসুবিধার মধ্যে এঁদের চলতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

অধুনা আর এক শ্রেণীর সখের নাটুকে দলের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন অফিস কর্মচারীদের রিক্রিয়েশান ক্লাবগুলি এই নাট্যানুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন। এঁদের কিন্তু আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয় না। সেটি মস্ত সুবিধা। উপরন্তু অফিস কর্মচারীদের মধ্যে অনেক প্রথম শ্রেণীর শিল্পী রয়েছেন, নাট্যকারও হয়ত আছেন। তাই, আমার মনে হয়, বাংলা নাটকের ঈপ্সিত উন্নতির প্রতি সচেষ্ট হওয়া তাঁদের পক্ষে অনেকাংশেই সম্ভবপর।

অফিস রিক্রিয়েশান ক্লাবগুলির অভিনয়-অনুষ্ঠান যে উল্লেখযোগ্য হতে পারে, তার একটি প্রমাণ পেলাম নিউ ইণ্ডিয়া এস্যুরেন্স কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠান নিউ ইণ্ডিয়া রিক্রিয়েশান ক্লাবের "বৈকুণ্ঠের উইল" নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে। অরুণ দত্ত, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন মজুমদার, জ্যোতিশ ঘোষ, শৈলেন ঘোষ, বীরেন চক্রবর্তী, তারা ভাদুড়ী, মীরা প্রধান অভিনয়ে সত্যিই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই গোষ্ঠী নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে নতুন নাটক অভিনয় করা চলতে পারে। আশা রাখি পেশাদার মঞ্চে অভিনীত নাটক নয়, নতুন ধরণের নাটক ভবিষ্যতে মঞ্চস্থ করে উপরিউক্ত ক্লাব একথার প্রমাণ দেবেন।

হীরেন বসু

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ প্রকাশিত ও ২, ফায়রক্স লেনস্থ টেম্পল প্রেস হইতে মুদ্রিত।

THE WALLACE FLOUR MILLS CO.
LIMITED
LEADING FLOUR MILLS IN INDIA
BIGGEST UNIT
UNDER ONE MANAGEMENT
IN
ASIA
Manufacturing:
FLOUR, ATTA, RAWA, BESAN, BRAN.
Importers of WHEAT
&
Exporters of FLOUR
Managing Agents:
VISSANJI SONS & CO. LTD.
9, WALLACE STREET,
Fort, BOMBAY
Representatives:
ALSALES LIMITED
30, BENTINCK STREET,
CALCUTTA.
Phone: CITY 1070

THE ORIENTAL MERCANTILE CO., LTD.
CALCUTTA, BOMBAY, KANPUR, DELHI.